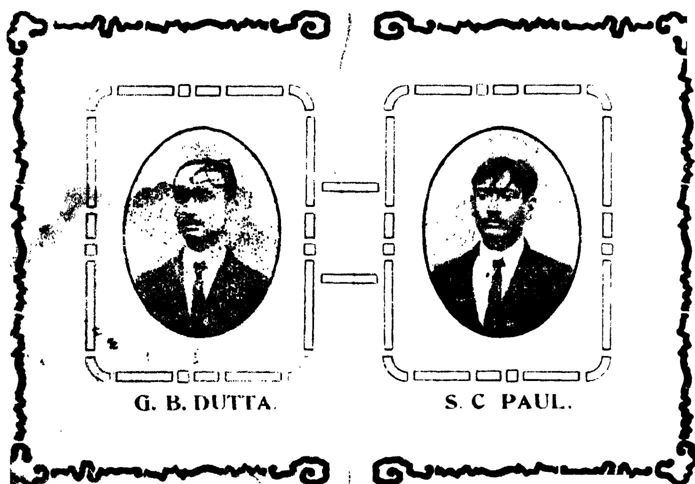


শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী।

এক টাকা সংস্করণ।

প্রকাশক—
শ্রীগোষ্ঠবিহারী দত্ত,
শ্রীশরৎচন্দ্র পাল।

কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির,
১১৮, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



Printer—PURNA CHANDRA CHAKRAVARTY,
VIDYODAYA PRESS,
8-2, Kashi Ghosh Lane, Calcutta.

উপহার

....

....

....

....

শ্রী...

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পৌত্র, স্বর্গীয় দামোদর মুখোপাধ্যায়ের দৌহিত্র

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় বিরচিত

রাজপুতনার লীলা-লাস্য-ললিত

রাজপুতের মেয়ে

আমাদের চৈত্রের ঊনবিংশ সম্পূর্ণ উপন্যাস।

গ্রন্থকারের নিবেদন।

"মণিবেগম" প্রকাশিত হইল। আমার নূতন রচনা ও পুরাতন রচনা—দুইয়ের সমাবেশে এই গ্রন্থ-খণ্ড বিরচিত।

এক হিসাবে এই "মণিবেগম" কিয়ৎপরিমাণে আমার পুরাতন রচনার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিলেও অন্য হিসাবে ইহা অভিনব মূর্ত্তিতে প্রকাশিত —"মণিবেগম।"

এই গ্রন্থ খণ্ড—মণিবেগম উপন্যাসের প্রথম অংশ। মণিবেগম কি প্রকারে শত্রুমিত্র সকলের প্রীতিভাজন **মণিবেগম**, এই উপন্যাসে অপর অংশে তাহারই পরিচয় আছে।

যে নামে যে ভাবেই হউক, গ্রন্থের নিগূঢ় লক্ষ্য—লোক-দৃষ্টির আকর্ষক হউক, ইহাই আকাঙ্ক্ষা। ইতি—২০এ ফাল্গুন, ১৩২৭ সাল।

"পৃথিবীর ইতিহাস"
কার্য্যালয়।
হাওড়া।

নিবেদক
শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী

কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির



শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী।

উপন্যাস-সিরিজ।

মণিবেগম।



প্রথম খণ্ড।



"উদুত্তমং মুমুগ্ধি নো বি পাশং মধ্যমং চৃত।
অবাধমানি জীবসে।"

ঋগ্বেদ।

***

সাধুগণ প্রার্থনা করেন,—

'হে ভগবন্! আমার ত্রিবিধ বন্ধন মোচন করুন। উত্তম, মধ্যম ও অধম—কোনও বন্ধন যেন আমাকে আবদ্ধ না করে।'

আর, আমাদিগের চেষ্টা,—

কিসে বন্ধনের পর বন্ধন আসিয়া আমাদিগকে আবদ্ধ করে,—বন্ধনের নাগপাশকে আমরাই আকর্ষণ করিয়া আনি।

"ধনলিপ্সা রূপতৃষা বিষম বন্ধন।
নাগপাশ সম বান্ধে জীবে অনুক্ষণ॥"

***

মুখবন্ধ



১। বন্ধনের সূত্র।

"কি সংবাদ? হঠাৎ ফিরে এলে যে!"

"আজ্ঞে, শুধু ফিরে আসিনি! এক অমূল্য মণি লুণ্ঠন করে এনেছি!"

"ভোর রাত্রে পুরী লুণ্ঠন ক'রবার কথা ছিল নয়? তোমরা সন্ধ্যার প্রাক্কালে ফিরে এলে কি করে?"

"ততদূর অগ্রসর হ'বার পূর্ব্বেই যে রত্ন হস্তগত হয়েছে, আপনাকে তা সর্ব্বাগ্রে উপঢৌকন দেওয়া আবশ্যক মনে করেই ফিরে এসেছি।"

সেনাপতি একটু বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিয়া কহিলেন,—"সে আবার কি কথা—রহমন? আমার জন্য আমি তো কোনও সামগ্রীই আন্‌তে বলিনি! যা কিছু লুণ্ঠিতদ্রব্য আসবে,সকলই তো নবাব-সরকারের তোষাখানায় জমা হবে!"

রহমন সঙ্কুচিতভাবে উত্তর দিল,—"আপনার যা আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী, আপনার জন্যই তা আনা হয়েছে।"

সেনাপতি উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন,—"আমার আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী! পুনর্ব্বার একথা উচ্চারণ ক'রলে, তুমি দণ্ড পাবে—জেনে রেখ রহমন! নবাবের প্রাপ্য সামগ্রীর প্রতি আমি কোনও দিন কোনও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছি কি?"

রহমন মনে মনে কহিল,—'সেনাপতি! মনের অগোচর পাপ নাই। আপনার অন্তরকেই জিজ্ঞাসা করে দেখুন দেখি, নবাবের অভীপ্সিত কোনও সামগ্রীর প্রতি আপনি প্রলুব্ধ কিনা?' সঙ্গে সঙ্গে রহমনের হৃদয়ে একটা প্রতিধ্বনি উঠিল,—'প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা!' রহমন্ প্রকাশ্যে উত্তর দিল,—"আজ্ঞে, যে রত্ন এনেছি, সে রত্নের সহিত নবাবের কোনও সম্বন্ধ নাই। সে মণি—আপনারই কণ্ঠভূষণ!"

সেনাপতি একটু বিস্মিতভাবে কহিলেন,—"রহমন! তুমি যে কি বল্‌ছ, তা আমি বুঝতে পারছি না।"

রহমন। আজ্ঞে, সে মণি—মণি! দশ হাজার টাকা দিয়ে সাজাহানাবাদ থেকে যে মণি কিনে আনা হয়েছে! মাসিক পাঁচ শত টাকা ব্যয় করে যাকে রক্ষা কর্‌তে হচ্ছে! সে মণি আপনারই।

মীরজাফর চমকিয়া উঠিলেন। কি যেন একটা পুরাতন স্মৃতি-লেখা বিদ্যুতের প্রবাহের ন্যায় তাঁহার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইল। তিনি একটু ব্যগ্রভাবে কহিলেন,—"রহমন! হেঁয়ালীর ভাষা ত্যাগ কর। তুমি কি বল্‌ছ, স্পষ্ট করে বল।"

রহমন। আজ্ঞে, অস্পষ্ট তো কিছু বলি-নি।

মীরজাফর। তুমি সকল বিষয়েই রহস্য করে থাক! তুমি রহস্যপটু বলে তোমার সকল কথাই উড়িয়ে দিই। কিন্তু রহস্যের সময় অসময় আছে।

রহমন একটু বিনীতস্বরে উত্তর দিল,—"আজ্ঞে, রহস্য করি-নি। যা, সত্য, তাই বলেছি। অনুমতি দেন, এখনই সে রত্ন সম্মুখে এনে উপস্থিত কর্‌ছি। রত্ন—আপনার হয়, আপনি গ্রহণ কর্‌বেন; না হয়, নবাব-সরকারে ভেট্ দেবেন। এই বলিয়া, মৌন-সম্মতি লক্ষণ পাইয়া, রহমন উদ্যান-বাটিকার বহির্ভিমুখে প্রস্থান করিল। মীরজাফর, প্রায়ই সন্ধ্যার প্রাক্কালে এই উদ্যান-বাটিকায় বিশ্রাম করিতে আসিতেন; কোনও কোনও রাত্রিতে এখানে নির্জ্জনবাসে অবস্থিতি করিতেন। মীরজাফর গভীর চিন্তা-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। সত্যই কি সেই? মণি—আমার কণ্ঠমণি! আবার কি আমি তারে ফিরে পাব? কার লোভ নেই তার প্রতি? দিল্লীর দরবারে সকলেরই মনোহরণ করেছিল সে! মুর্শিদাবাদে এসে সকলেরই মনোভূষণ হয়ে আছে সে! তার প্রতি লোলুপ দৃষ্টি—কত জনের, সে কি আমার হবে? নবাবের ভয়ে ভাল করে একদিন দেখ্‌তে পাই-নি তারে? শা-খানুম খরদৃষ্টি রেখেছিল তার প্রতি! বোধ হয়, ভাই-বোনে যুক্তি করেই আমার দৃষ্টির অন্তরালে রাখ্‌তো তারে! 'আলিবর্দ্দী আশ্রয়দাতা ছিলেন—আমার; আপন ভগ্নী শা-খানুমকে-

আমার করে অর্পণ করে নবাব-সরকারে সম্মান বাড়িয়ে দিয়েছিলেন—আমার। তাই তখন লজ্জায় শঙ্কায় মণির সম্বন্ধে কোনও ব্যবস্থাই করতে পারি-নি! কিন্তু এখন আমি সেনাপতি! এখন আমার প্রবল প্রতাপ। এখন যদি একবার আমি দেখতে পাই, নিশ্চয়ই তারে আপনার করে নেই! নবাব!—সিরাজ! তাঁর ভয় অল্পই করি!

চিন্তার স্রোত পরিবর্তিত হইল! মীরজাফর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"বৃথা কি ভাবনা ভাবছি! মণি এখন কোথায়? আজ দু' তিন মাস তার সন্ধানই নেই! সে এখন ফিরিঙ্গীদের কুঠীতে গিয়ে নাচ-গান মুজ্‌রো করে বেড়াচ্ছে! তার আর এখানে ফির্‌বার কি সম্ভাবনা আছে? বিশেষতঃ নবাবের সঙ্গে ফিরিঙ্গীদের যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত, তাতে আসা-যাওয়ার পথ রোধ হয়ে গেল বলেই মনে হয়। রহমন কি বল্‌তে কি বলে গেল। তার ঐ হেঁয়ালীর কোনও অর্থ হয় না।"

সহসা চিন্তার গতি অবরুদ্ধ হইল। হরিদ্রাভ রেশমী-বস্ত্রাবৃত একখানি শিবিকা, মীরজাফরের প্রকোষ্ঠ-দ্বারে উপস্থিত হওয়ায়; তিনি মন্ত্র-চালিত পুত্তলিকার ন্যায় তদভিমুখে উপস্থিত হইলেন।

* * *

২। প্রতিজ্ঞার বন্ধনে।

এক অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতী, শিবিকার অভ্যন্তর হইতে অবতরণ করিলেন। তখন, সান্ধ্য-গগনে নবমীর চন্দ্র উদিত হইয়া দিক্ উদ্ভাসিত করিতেছিলেন; মনে হইল, নবাবের অলিন্দে আসিয়া তিনি যেন রমণী মূর্ত্তি ধরিয়া দাঁড়াইলেন।

মীরজাফর হস্তধারণ-পূর্ব্বক মণিকে আপন প্রকোষ্ঠাভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। শিবিকা ও বাহকগণ সহ রহমন, চকিতের মধ্যে অদৃশ্য হইল। মনে মনে কহিল;—"বন্ধু বেগম! তোমার বড় গর্ব্ব হয়েছে! এইবার দেখ—প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—কেমন প্রতিহিংসা!"

প্রকোষ্ঠ আলোক-পুলকিত ছিল। সে আলোকে মণির রূপচ্ছটায়

নবালোক উদ্ভাসিত হইল। সেনাপতি, মণির মৃণাল-কোমল বাহুদ্বয়-সংলগ্ন পদ্মদলসন্নিভ তাঁহার হস্ত দু'খানি ধারণ করিয়া, আনন্দ-গদগদ-স্বরে কহিলেন,—"মণি! আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম—বল্‌তে পারি না! অমাবস্যায় যে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয়, জগতে এই নূতন দেখ্‌লাম!"

মণি কটাক্ষ করিয়া কহিল,—"আপনাদের কথাই সার! কথা আমি অনেক শুনেছি। কথা আর শুন্‌তে চাই না।"

সেনাপতি। মণি! মনের ভাব কথায় বুঝাবার নয়। আমি সেই থেকে পাগলের ন্যায় হয়ে আছি!

মণি। তা হলে আর ভুলেও একবার সন্ধান নিতেন না?

সেনাপতি। বল্‌লে, হয় তো তুমি বিশ্বাস কর্‌বে না! নবাব আলিবর্দ্দী জীবিত থাক্‌তে, তুমি জান্‌তেই তো, তোমার সম্বন্ধে আমার কোনও হাত ছিল না। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর থেকে, আমি তোমার জন্য কত সন্ধানই করেছি। কত যায়গায় কত লোক পাঠিয়েছি। কিন্তু কেউ তোমার সন্ধান দিতে পারে-নি।

মণি ভ্রূকুটিভঙ্গীসহ উত্তর দিল,—"আমি বিশ্বাস করি না যে, আমার জন্য আপনার হৃদয়ের এক কোণেও একটু স্থান আছে!"

মীরজাফর ব্যগ্রভাবে কহিলেন,—"মণি! যদি দেখাবার হতো বুক চিরে দেখাতে পার্‌তাম—তুমি হৃদয়ের কতখানি স্থান কেমন ভাবে অধিকার ক'রে আছ! তুমি কি বিশ্বাস কর্‌বে—মণি!" মণি সঙ্কুচিতা হইয়া কহিল—"মেহেরবান্! এই বাঁদীর প্রতি এতই করুণা!"

মীরজাফর।—"মণি! মনে রেখ, মীরজাফর মিথ্যা কহে নাই।"

মণি উদ্বেলিত কণ্ঠে উত্তর দিল,—"নবাব! নবাব! আমায় ক্ষমা কর্‌বেন! কি বল্‌তে কি বলেছি, যদি অন্যায় হয়ে থাকে, অবলা বলে ভুলে যাবেন।"

'নবাব' সম্বোধনে মীরজাফর একটু চমকিয়া উঠিলেন; কহিলেন,—

"আমায় বিদ্রূপ কর কেন মণি? আমি নবাব নই। নবাব—সিরাজুদ্দৌলা! তাঁর জন্য তুমি যদি ব্যাকুল হও, ভাল, সেই ব্যবস্থাই করা যাবে।"

মণির চক্ষুপ্রান্তে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল। তাঁহার রক্তিম গণ্ডস্থলে সে বিন্দু রক্তাভমূর্ত্তি ধারণ করিল। মণি বাষ্পগদগদ-কণ্ঠে কহিল,—"জাঁহাপনা! বজ্র হতে কঠোর এমন কঠিন কথা কেন বল্‌লেন? তার প্রাণপ্রিয় এই আপনাকেই স্পর্শ করে মণি শপথ করে বল্‌ছে, মণি আপনাকে ভিন্ন আর দ্বিতীয় জানে না। নাথ! নিশ্চয় জান্‌বেন—মণির প্রাণ-মন আপনাকেই সমর্পিত হয়ে আছে। তবে যে মণি আজ আপনাকে নবাব ব'লে সম্বোধন করেছে, তারও কারণ আছে। মণির অন্তরাত্মা বল্‌ছে—আজি হউক আর কালি হউক, মণি আপনাকেই বাঙ্গালার মস্‌নদে অধিষ্ঠিত দেখ্‌বে। নাথ! যদি তা হয়—" মণি আপন মৃণাল-ভুজদ্বয়ে মীরজাফরের কণ্ঠদেশ বেষ্টন করিয়া ধরিল; কহিল,—"নাথ! যদি—তাই হয়—"

মীরজাফর সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন,—"তাই যদি হয়, মণি আমার পাট-বেগম হবে।"

"নাথ! সত্যি—সত্যি বল্‌ছেন কি?"

মণির বীণা-বিনিন্দী কণ্ঠের এই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই মীরজাফর আবার কহিলেন,—"তাই—তাই হবে।"

"সত্য—সত্য বল্‌ছেন?"

"মীরজাফর কখনও মিথ্যা বলে নাই।"

"সত্য—সত্য বল্‌ছেন?"

"মীরজাফর কখনও মিথ্যা বলে নাই।"

মণি গদগদকণ্ঠে উত্তর দিল,—"এত না হলে আর দাসী আপনার চরণে বিক্রীত হয়ে আছে!"

মণিবেগম।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বন্ধন-মোচন।

"বালো যুবা চ বৃদ্ধশ্চ যঃ করোতি শুভাশুভম্।
তস্যাং তস্যামবস্থায়াং ভুঙ্‌ক্তে জন্মনি জন্মনি॥"

—ব্যাস-বাক্য।

"আহা! বেঁধ' না বেঁধ' না! ছেড়ে দেও—ছেড়ে দেও!"

"আমি পুষ্‌ব যে!"

"বন্ধনে বড় কষ্ট! বন্ধন মুক্ত ক'রে দেও! দেখ্‌ছ না—পাখী কাঁদ্‌ছে কত!"

"আমি একে যত্ন ক'র্‌ব—খাঁচায় রাখ্‌ব! ফড়িং ধ'রে এনে দেব—ছাতু খেতে দেব—কত ভালবাস্‌ব!"

"অবোধ বালক! পাখী অনন্ত-আকাশের উন্মুক্ত বায়ুক্রোড়ে বিচরণ করে; বন্ধনে তার কি কষ্ট—তুমি কি বুঝ্‌বে? ছেড়ে দেও—ছেড়ে দেও।"

"ছেড়ে দেব কেন?—আমি যে পাখীটিকে কিনেছি! কষ্ট দেব কেন?—আমি যে ওর জন্য সুন্দর পিঞ্জর প্রস্তুত করিয়েছি! সেই পিঞ্জরে ওকে রাখ্‌ব, প্রত্যহ ক্ষীর-সর-ননী খেতে দেব। কত যত্নে—কত আদরে লালন-পালন ক'র্‌ব! ওর কোনই কষ্ট হবে না।"

"পাখী তোমার যে যত্ন চায় না। তাই দেখ ঐ—পাখী পালাবার জন্য কত আকুলি-ব্যাকুলি ক'র্‌ছে! তুমি একবার ওকে ছেড়ে দেও দেখি; ও এখনি উধাও হ'বে উড়ে যাবে!"

"দুই এক দিন আমার যত্ন পেলেই পাখী পোষ মান্‌বে!"—এই বলিয়া, বালক, অনন্যমনা হইয়া, পাখীর পায়ে দড়ি বাঁধিতে লাগিল।

বালকের নাম—গোপাল। গোপাল কেবল নামে গোপাল নহে;—রূপ-মাধুর্য্যেরও যেন সাক্ষাৎ গোপাল-মূর্ত্তি! সৌন্দর্য্য ফুটিয়া বাহির হইতেছে। আকর্ণ-বিস্তৃত বিস্ফারিত নয়নদ্বয়—সেই সৌন্দর্য্যের কেন্দ্রীভূত হইয়া আছে। গোপালের পরিধানে পট্ট-বস্ত্র; গোপাল মালকোঁচা বাঁধিয়া পরিয়া আছে। গোপালের পায়ে মল, হাতে বালা, কোমরে গোট; মস্তকে ঘন-কৃষ্ণ কেশরাশি বেণীবদ্ধ হইয়া দোদুল্যমান। গোপালের অধরোষ্ঠ, হস্তপদতল—অলক্তক-রঞ্জিত। ললাট, বক্ষ,—সকলই সুলক্ষণাক্রান্ত। এই সুলক্ষণাক্রান্ত বালক কেন পাখীটিকে ধরিয়া কষ্ট দিতেছে!

একজন সন্ন্যাসী সেই পথে যাইতেছিলেন। বালক একমনে পাখীটিকে বাঁধিতেছে দেখিয়া, তিনি একটু বিচলিত হইলেন। তাই তিনি বালককে বুঝাইয়া পাখীটিকে ছাড়িয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

গোপাল সন্ন্যাসীর অনুরোধ শুনিল না। সে এক মনে পাখীটিকে বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইল। পাখী ছটফট করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

সন্ন্যাসী আবার বলিলেন,—"তুমি আমার কথা শোন! পাখীটি ছেড়ে দেও। আহা! দেখ দেখি—পাখী কত ছট ফট কর্‌ছে।"

পাখীটিকে বাঁধিতে যাইয়া, সন্ন্যাসীর কথায় গোপাল এক-এক বার অন্যমনস্ক হইতেছে; সুতরাং তাহার বন্ধন-কার্য্যে বিঘ্ন ঘটিতেছে। এবার তাই সে একটু বিরক্ত হইয়া বলিল,—"কেন টিক্‌টিক্ কর্‌ছেন? খাঁচায় নিয়ে গিয়ে রাখ্‌লেই পাখী শান্ত হবে,—পাখীর ধড়ফড়ানি আর থাক্‌বে না!"

সন্ন্যাসী। তাও কি কখন সম্ভবপর! মনে কর দেখি,—তোমায় যদি কেহ এইরূপ-ভাবে বেঁধে নিয়ে যায়,—তোমার পিতামাতার কাছে আর আস্‌তে না দেয়,—খাঁচার মধ্যে পূরে রাখে,—তোমার তখন কি কষ্ট হয়? বন্ধনে পাখীরও সেই কষ্ট!—বেশী বই কম নয়। তোমাকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে, লোকালয়ে মানুষের কাছে—মানুষের ঘর বাড়ী-সংসারের ভিতরে রাখলেও তোমার প্রাণটা কত ব্যাকুল হয়—ভাব দেখি! কিন্তু পাখীকে উন্মুক্ত আকাশ-রূপ তাহার বিচরণ-স্থান পরিত্যাগ ক'রে ক্ষুদ্র পিঞ্জরে সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্ম্মাবলম্বী মানুষের কাছে থাকৃতে হবে। তার কষ্ট কত অধিক—অনুভব করতে পার কি?

গোপাল একটু বিচলিত হইল; কিন্তু পাখীটিকে পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইল না।

সন্ন্যাসী কহিলেন,—"ভাল—তোমার পাখীটি আমি বেঁধে দিচ্ছি। কিন্তু তোমায় আমি ধ'রে নিয়ে যাব। পিতা-মাতা আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ ক'রে আমাদের নিকট থাকৃতে যদি তোমার কষ্ট বোধ না হয়, এই পাখীটিকে আর তোমায় ছেড়ে দিতে ব'লব না।"

এই বলিয়া সন্ন্যাসী গোপালকে ধরিয়া লইয়া যাইবার ভাব প্রকাশ করিলেন।

গোপাল কহিল,—"আপনার সঙ্গে আমি যা'ব কেন?"

সন্ন্যাসী। পাখীই বা তোমার সঙ্গে যাবে কেন?

গোপাল। আমি কিনেছি;—সুন্দর খাঁচা প্রস্তুত ক'রে রেখেছি! কত আদর ক'রে ক্ষীর-সর-ননী খাওয়াব!

সন্ন্যাসী। আমিও তোমাকে আদর ক'র্‌ব—আমিও তোমাকে ক্ষীর-সর-ননী খাওয়াব। তবে তুমি আমার সঙ্গে যেতে স্বীকার কর্‌ছ না কেন!

গোপাল। আমার নিজের দেশ, নিজের গ্রাম, নিজের পিতামাতা,—এ সব পরিত্যাগ ক'রে আমি কেমন ক'রে পরের সঙ্গে যেতে পারি? আমার এ স্বাধীনতা পরিত্যাগ ক'রে, আমি কেন পরের নিকট বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে যাব?

সন্ন্যাসী। পাখীরও নিজের দেশ, নিজের পিতা-মাতা, নিজের স্বাধীনতা আছে। সে সুখ পরিত্যাগ ক'রে, সেই বা কেমন ক'রে তোমার বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে যাবে? সে যে উন্মুক্ত-গগন-বিহারী বিহঙ্গম! তার স্বাভাবিক গতি তাকে আপনিই অনন্ত-গগন-পথে আকর্ষণ ক'রে নিয়ে যাবে! তুমি তাকে স্বর্ণ-পিঞ্জরে রেখেছ, কি লৌহ-পিঞ্জরে রেখেছ, সে একবারও তা ভেবে দেখবে না;—তোমার ক্ষীর-সর-নবনী খাদ্য-দ্রব্যের প্রলোভনেও সে কদাচ প্রলুব্ধ হবে না! তুমি কি দেখ-নি—কত যত্ন, কত আদরের পরও, একবার পিঞ্জরের দ্বার উন্মুক্ত পেলে, বিহঙ্গম কেমন উধাও হ'য়ে উড়ে পালায়!

গোপাল সন্ন্যাসীর মুখপানে চাহিয়া দেখিল। সেই প্রশান্ত-গম্ভীর জ্যোতির্ম্ময় মুখমণ্ডলের প্রতি যতই তাহার দৃষ্টি পড়িতে লাগিল, সে যেন ততই আত্মহারা হইয়া পড়িল। গোপালের চিন্তার গতি পরিবর্ত্তিত হইল। এক একবার তাহার মনে হইতে লাগিল,—"সত্যই তো! স্বাধীন গতি

রোধ করিতে যাওয়া—বন্ধন করিতে চেষ্টা পাওয়া—পাখী কেন, সকল প্রাণীর পক্ষেই তো দারুণ কষ্টদায়ক ! আমাকে যদি কেহ বন্ধন করিয়া লইয়া যায়, আমার প্রাণ বিদীর্ণ হয় না কি ?"

চিন্তার স্রোতে ভাসমান হইয়া, গোপাল মনে মনে বলিল,—"না—না ! আমি এমন কাজ আর করিব না। আমি পাখীটিকে ছাড়িয়া দিই।"

সন্ন্যাসী গোপালকে নীরব দেখিয়া পুনরপি কহিলেন,—"কি বালক ! তবে কি তুমি আমার সঙ্গে যাবে ?"

গোপাল উত্তর দিল,—"না—আমি যাব না ! আমি পাখীর বন্ধন মোচন ক'রে দিচ্ছি। বুঝেছি—বন্ধনই কষ্টের মূল ! বুঝেছি—বন্ধন-মোচনই পরম সুখ ! আমি অবশ্যই বন্ধন-মোচন ক'রব।"

এই বলিয়া গোপাল পাখীটিকে উড়াইয়া দিল। যেন মৃতপ্রাণে নব-জীবন লাভ করিয়া, পাখী গগন-মার্গে উড্ডীন হইল।

কি জানি কেন, সন্ন্যাসী শিহরিয়া উঠিলেন।

"বন্ধনই কষ্টের মূল ! বন্ধন-মোচনই পরম সুখ !" বালক এ কি কথা বলিল ! আবেগ-পূর্ণ কণ্ঠে গোপালকে সম্বোধন করিয়া সন্ন্যাসী গম্ভীর-স্বরে কহিলেন,—"বালক ! তুমি সত্যই বলিয়াছ,—বন্ধনই কষ্টের মূল, বন্ধন-মোচনই পরম সুখ।"

সন্ন্যাসী আবার কহিলেন,—"দেখ—দেখ, বন্ধন-মোচনে পাখীর কত আনন্দ। যত যত্নই কর না কেন, পিঞ্জরে আবদ্ধ ক'রে রাখলে কি ওর এত আনন্দ হ'ত ! ওকে পুষলে—তুমিই যে আনন্দ লাভ ক'র্‌তে, তাও আমার মনে হয় না। তাতে কত বাধা বিঘ্ন ছিল ;—কত বিপদ-আপদ ঘটতে পার্‌ত ; হয় তো পাখীটিকে কোন্ দিন কিসে মেরে ফেল্‌ত ;—হয় তো দিনে দিনে ক্ষয় হ'য়ে পাখী কোন্ দিন আপনা-আপনিই ম'রে যেত ; তাতে তোমার মনে কত কষ্ট হ'ত, ভাব দেখি !"

গোপাল উত্তর দিল,—"পিঞ্জরে না রাখলে তো আর পাখী পোষা হয় না! আমার যে পাখী পুষতে বড় সাধ ছিল।"

সন্ন্যাসী। পিঞ্জরে না রাখলে কি আর পোষা হয় না! মনে কর না কেন,—ঐ যে বৃক্ষের উপরে, ঐ যে আকাশের গায়ে, অগণিত বিহঙ্গম বিচরণ ক'রে বেড়াচ্ছে, ঐগুলির সবই তোমার পোষা পাখী! তুমি খাঁচায় পূরে রেখে একটি পাখীকে আপনার ব'লে মনে কর্‌ছ; আর তাতেই তোমার আনন্দ হ'চ্ছে! কিন্তু ঐ পাখীগুলিকে আপনার ব'লে মনে ক'র্‌লে. তোমার কত পাখী হয়, আর তাতে কত আনন্দ হয়—ভাব দেখি! তুমি ভাবনা কেন,—অনন্ত-গগন-বিহারী বিহঙ্গমগুলি সকলই তোমার! সামান্য লৌহ-পিঞ্জরে একটি পাখীকে আবদ্ধ ক'রে রেখে কতটুকু আনন্দ! কিন্তু ঐ অনন্ত উন্মুক্ত আকাশের অসংখ্য পাখীকে আপনার ব'লে মনে করায় যে আনন্দ, সে আনন্দের কি শেষ আছে?

গোপাল পলকহীন-নেত্রে সন্ন্যাসীর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

সন্ন্যাসী আরও বলিলেন,—"বন্ধন! বন্ধনে পাখীটীরে আবদ্ধ ক'রে, তুমিও যে অধিকতর বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে!—সে কথা কি একবারও ভেবে দেখেছ? পাখীটিরে সময়ে আহার দিতে হ'ত;—সর্ব্বদা সাবধানে রাখ্‌তে হ'ত;—এইরূপ কত বন্ধনেই তোমাকে. আবদ্ধ হ'তে হ'ত! তুমিই ব'লেছ—'বন্ধনই কষ্টের মূল, বন্ধন-মোচনই পরম সুখ!' তবে কেন আপনার বন্ধন আপনি দৃঢ় ক'রতে যাচ্ছিলে!"

গোপালের হৃদয়-তন্ত্রী সেই স্বরে বাজিয়া উঠিল। গোপালের হৃদয়ে হৃদয়ে সেই মন্ত্র প্রবিষ্ট হইল। গোপাল মনে মনে বলিল,—"বন্ধনই কষ্টের মূল;—বন্ধন-মোচনই পরম সুখ! আমি বন্ধন-মোচনেরই চেষ্টা করিব।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।





পরিচয়।

"No sceptre greets me—no vain shadow this."

—Wordsworth.

সে প্রায় দেড় শত বৎসর অতীত হইল। রাজসাহীর অন্তর্গত একটী পল্লীগ্রামে গোপালের সহিত সন্ন্যাসীর এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল।

গ্রামের নাম—আটগ্রাম। কিংবদন্তী এইরূপ—ঐ গ্রাম পূর্ব্বে গোপালপুর নামে পরিচিত ছিল। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, গ্রামখানি তখন কোন্ নামে অভিহিত হইত, পুরাতত্ত্বানুসন্ধানে তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। কেহ বলেন,—গোপালের বয়ঃক্রম যখন নবম বর্ষ উত্তীর্ণ প্রায়, ঐ গ্রাম সেই সময়ে 'আটগ্রাম' নাম প্রাপ্ত হয়; কেহ আবার বলেন,—'না—না, তা নয়, আবহমান-কাল হইতেই গ্রামখানি আটগ্রাম নামে প্রসিদ্ধ।' যাহা হউক, গ্রামখানি যে নামেই তখন পরিচিত থাকুক না কেন, আমরা কিন্তু আটগ্রাম বলিয়াই উহাকে অভিহিত করিলাম।

এখন যেখানে নাটোর মহকুমা, পূর্ব্বে যেখানে অর্দ্ধবঙ্গেশ্বরী মহারাণী ভবানীর রাজধানী ছিল, তাহার প্রায় বার ক্রোশ উত্তরে, একটী বিস্তৃত বিলের ধারে আটগ্রাম অবস্থিত। ঐ গ্রাম—আমরুল পরগণার অন্তর্গত।

আটগ্রাম—মহারাণী ভবানীর জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। মহারাণী হরিদেব রায়কে সেই সম্পত্তি পুরস্কার-স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। সে অবশ্য পরবর্ত্তি কালের ঘটনা; সে পরিচয় যথাস্থানে প্রদত্ত হইবে।

জমিদারী মহারাণীর হইলেও, হরিদেব রায়—আটগ্রামের এক জন গণ্য মান্য ব্যক্তি ছিলেন। যে বংশ নাটোর-রাজ্যের অধিপতি হইয়াছিলেন, হরিদেব রায় সেই বংশের অন্যতম বংশধর। নাটোরের রাজা রামজীবন রায়ের পিতা কামদেব রায় এবং হরিদেব রায়ের প্রপিতামহ অভিরাম রায়, উভয়ে সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। ঐ বংশের আদি পুরুষ মথুরানাথের তিন পুত্র—রতিরাম, কামদেব এবং অভিরাম; রতিরাম জ্যেষ্ঠ, কামদেব মধ্যম, অভিরাম কনিষ্ঠ। কামদেবের সন্তানগণ সৌভাগ্যক্রমে নাটোর রাজ্যের আধিপত্য লাভ করেন।

অভিরামের দুই বিবাহ;—তাঁহার প্রথমা পত্নীর গর্ত্তজাত সন্তানেরা মাধনগরে বসতি করিয়া 'মাধনগরের রায়' আখ্যা প্রাপ্ত হন; আর দ্বিতীয় পত্নীর গর্ত্তজাত সন্তানেরা আটগ্রামে বসতি করেন। অভিরামের জ্যেষ্ঠপুত্র রামনারায়ণ হইতে মাধনগরের রায়-বংশের এবং তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র মহাদেব রায় হইতে আটগ্রামের রায়-বংশের উৎপত্তি।

হরিদেব—মহাদেবের কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি অতি সুপুরুষ ছিলেন। তাঁহার সময় হইতে আটগ্রাম রায়-বংশের জমিদারী মধ্যে পরিগণিত হয়। তিনি আটগ্রামের বহু উন্নতি-সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র। আমাদের এই প্রসঙ্গোক্ত গোপাল—তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র। গোপালের ন্যায় রূপ-সম্পন্ন বলিয়াই, কনিষ্ঠ পুত্রকে তিনি গোপাল বলিয়া আদর করিতেন। সেইজন্য সকলেই তাহাকে গোপাল বলিয়া সম্বোধন করিত; আমরাও তাই বালককে গোপাল বলিয়া পরিচিত করিলাম।

হরিদেব রায়ের বসত-বাটীর পশ্চিমাংশে একটী বৃহৎ বাগান ছিল;

বাগান—আম, জাম, নারিকেল, গুবাক, প্রভৃতি নানা বৃক্ষে পরিপূর্ণ। যখনই যিনি সেই বাগানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন, তখনই তিনি দেখিতে পাইতেন, কোন-না-কোনও বৃক্ষে কোন-না-কোনও রূপ ফল ফলিয়া আছে। বাগানের উত্তর পার্শ্বে—সড়ক। সড়কের উত্তরে বিল।

বিলের ধারে, সড়কের উপর, আম্রবৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া, গোপাল পাখীর পায়ে দড়ি বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছিল। একজন বেদিয়া সেইদিন প্রাতঃকালে পাখী বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল। সেই বেদিয়ার নিকট হইতে গোপাল এবং রাখাল দুই জনে দুইটী পাখী ক্রয় করিয়াছিল।

রাখাল—গোপালের খেলার সাথী। উভয়ের মধ্যে বড়ই সদ্ভাব। গোপাল পাখী কিনিল দেখিয়া, রাখালও পাখী কিনিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল! গোপাল তাড়াতাড়ি বাড়ী হইতে পাখীর মূল্য আনিয়া দিয়া, পাখীটিকে গ্রহণ করিবামাত্র রাখাল বেদিয়াকে আপন বাড়ীতে ডাকিয়া লইয়া যায়।

গোপালের হাতে পাখীটি সমর্পণ করিয়া বেদিয়া চলিয়া যাওয়ার অব্যবহিত পরেই সন্ন্যাসী আসিয়া সেই স্থানে উপনীত হন।

সন্ন্যাসীর নাম—শ্রীজী। শ্রীজী—অনুপম শ্রী-সম্পন্ন। যেমন গঠন, তেমনই রং। যদি তিনি সন্ন্যাসী-বেশে উপস্থিত না হইতেন, তাঁহাকে রাজপুত্র বলিয়া ভ্রম হইত। তাঁহার বিস্তৃত ললাট, বিশাল বক্ষ; আজানু-লম্বিত বাহুদ্বয়, জ্যোতিঃপূর্ণ মুখমণ্ডল। আকর্ণ-বিশ্রান্ত নয়ন প্রান্তে ভ্রমরকৃষ্ণ ভ্রূ যুগল—সেই মুখমণ্ডলের কি অপূর্ব্ব শোভাই সম্পাদন করিয়াছে! তাঁহার চম্পক-বিনিন্দিত গৌরবর্ণে রক্তচন্দনের ত্রিপুণ্ড্রকে —সে শোভা আরও উজ্জল করিয়া তুলিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি লেপনে দেহজ্যোতিঃ ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় প্রতীত হইতেছে। পাটলবর্ণ

জটারাশি কুণ্ডলাকারে বিন্যস্ত হইয়া মুকুটের ন্যায় শোভা পাইতেছে। সেই প্রশান্ত-মূর্ত্তি সন্ন্যাসীর মুখে যেন চির-আনন্দ বিরাজমান।

সন্ন্যাসীর পরিধানে গৈরিক বসন। এক হস্তে কমণ্ডলু অপর হস্তে ত্রিশূল। সন্ন্যাসী যুবাপুরুষ।

এ কন্দর্পকান্তি যুবাপুরুষ কেন সন্ন্যাস-ব্রত অবলম্বন করিলেন?—সন্ন্যাসীকে দেখিলে দর্শকের মনে স্বতঃই সেই চিন্তার উন্মেষ হয়।

এই সন্ন্যাসী আর কখনও আটগ্রামে আসিয়াছিলেন কিনা, সে সম্বন্ধে অবশ্য মতবিরোধ আছে। প্রাচীনেরা—যাঁহারা এই সন্ন্যাসীকে দেখিয়াছিলেন—সন্ন্যাসী চলিয়া গেলে বলা-বলি করিতে লাগিলেন,—"ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ একজন সন্ন্যাসী একবার আটগ্রামে আসিয়াছিলেন। সেই সন্ন্যাসীর সহিত এই সন্ন্যাসীর কি যেন এক অপূর্ব্ব সাদৃশ্য আছে।" তাঁহাদের অনেকেরই মনে সংশয় হইয়াছিল,—ইনিই কি তবে তিনি? কিন্তু ত্রিশ বৎসরেও তো চেহারার কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই?" যাহা হউক, ত্রিশ-চল্লিশ বৎসরের কম বয়স্ক কোনও ব্যক্তিই সে বিষয়ের সাক্ষ্য দিতে পারে না। তাহারা কখনও এ সন্ন্যাসীকে দেখে নাই।

দেখা দূরে থাকুক, গোপাল কখনও এ সন্ন্যাসীর প্রসঙ্গ পর্য্যন্ত শুনে নাই! তবে কেন তাহার মনে হইতে লাগিল,—ইনি কে? আমি কি পূর্ব্বে ইহাঁকে কখনও দেখিয়াছি?"

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলে, বৃক্ষমূলে ছায়াতলে বসিয়া, গোপাল একমনে সেই ভাবনায় বিভোর হইয়া পড়িল।

গোপাল বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছে, এমন সময় রাখাল ফিরিয়া আসিল। বেদিয়ার নিকট হইতে পাখী কিনিয়া, পাখীটিকে খাঁচায় পূরিয়া, গোপালের সন্ধানে প্রথমে সে গোপালের বাড়ী গিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের

বাড়ীতে গিয়া তাহাকে দেখিতে পায় নাই ; তাই সে গোপালকে খুঁজিতে বিলের ধারে সুড়কের উপর আসিয়াছে। রাখালের হাতে খাঁচা, খাঁচার মধ্যে পূরিয়া সে তাহার সেই কেনা পাখীটিও সঙ্গে আনিয়াছে।

রাখাল—গোপালের প্রতিবাসী। তাহার পিতার নাম—হলধর মৈত্র। মৈত্র মহাশয় গোপালের পিতার ন্যায় সঙ্গতিসম্পন্ন ছিলেন না। কিন্তু তথাপি তিনি পুত্রের সাধ-পূরণে কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না। রাখাল তাঁহার একমাত্র পুত্র। সুতরাং রাখাল যখনই যাহা আব্দার করিত, তিনি তাহা পূরণ করিতে চেষ্টা পাইতেন।

গোপালের ন্যায় কান্তি-সম্পন্ন না হইলেও, রাখাল দেখিতে মন্দ ছিল না। গোপালের অপেক্ষা তাহার রং একটু কাল ছিল বটে ; কিন্তু মৈত্র মহাশয় বেশ-ভূষায় তাহাকে গোপালের মত করিয়াই সাজাইয়া রাখিতেন। গোপালের ন্যায় রাখালেরও তিনি অলঙ্কারাদি গড়াইয়া দিয়াছিলেন। গোপালের ন্যায় রাখালেরও পায়ে মল, হাতে বালা, কোমরে গোট ছিল। অধিকন্তু তিনি রাখালের গলায় একটী হাঁসুলি গড়াইয়া দিয়াছিলেন।

রাখাল ফিরিয়া আসিয়া দেখিল,—গোপালের হাতে পাখী নাই। গোপাল একমনে বসিয়া কি ভাবিতেছে! দেখিয়া, রাখাল আশ্চর্য্যান্বিত হইল ; কৌতুহল-বশে জিজ্ঞাসা করিল,—"হাঁ ভাই! তোর পাখী কি হ'ল ?"

গোপাল শুনিয়াও যেন শুনিতে পাইল না। রাখাল নিকটে গিয়া পুনরপি জিজ্ঞাসা করিল,—"তোর পাখীটা কি উড়ে গেল ? তাই তুই অমনি ক'রে ব'সে আছিস্ ? তুই বড় অসাবধান ভাই !"

গোপাল উত্তর দিল,—"পাখী উড়ে যায়-নি, আমিই তাকে উড়িয়ে দিয়েছি !"

রাখালের যেন বিশ্বাস হইল না। রাখাল বলিল,—"তা গিয়েছে—

গিয়েছে; তার আর কি হবে? মঙ্গলবার দিন আবার বেদে আস্‌বে; তুই আর একটা পাখী কিনে নিস্‌। সেদিন কিনে একেবারেই খাঁচায় পূরে রাখিস্‌।"

গোপাল। যদি কিনি, আমি সে পাখীকেও উড়িয়ে দেব। তোর পাখীটাকেও উড়িয়ে দেনা—ভাই?

রাখাল চমকিয়া উঠিল; বলিল,—"সে কি বলিস্‌? আমি দাম দিয়ে পাখী কিনেছি, আমি ছেড়ে দেব কেন? আমি ওকে পুষ্‌ব যে!"

গোপাল। ওর কত কষ্ট হ'চ্ছে, বুঝ্‌তে পার্‌ছিস্‌-নে?

এই বলিয়া, আকাশের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, গোপাল কহিল,—"ঐ দেখ্‌ দেখি—আকাশের পানে চেয়ে! ঐ পাখীগুলি কত আনন্দ ক'রে বেড়াচ্ছে! ওদের বেড়াবার স্থান অনন্ত আকাশ; এই ক্ষুদ্র পিঞ্জরে ওদের কি আবদ্ধ ক'রে রাখা উচিৎ? দে—দে-ভাই!—পাখিটিকে ছেড়ে দে!"

গোপাল রাখালের খাঁচার দিকে হাত বাড়াইল; বলিল,—"খাঁচার দরজা খুলে দিতে তোর কষ্ট বোধ হয়, আয়—আমি খুলে দিচ্ছি!"

গোপাল খাঁচার দরজা খুলিয়া দিতে গেল। রাখাল বেগতিক বুঝিয়া খাঁচা লইয়া সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, —"তোর মাকে আমি ব'লে দিচ্ছি। দেখ্‌বি এখনি—কি হয়।"

রাখাল চলিয়া গেল। গোপাল আবার সেই সন্ন্যাসীর ভাবনায় বিভোর হইয়া পড়িল। তাহার মনে হইতে লাগিল,—সে যেন সন্ন্যাসীকে কত বার দেখিয়াছে! তাহার স্মরণ হইতে লাগিল,—পূর্ব্বে ঐ সন্ন্যাসীর সহিত তাহার যেন কত পরিচয় ছিল! কিন্তু কোথায়—কত কাল পূর্ব্বে—স্মরণ করিয়া সে কিছুই স্থির করিতে পারিল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—o—

ভাবান্তর।

"I, with my fate contented, will plod on,
And hope for higher raptures, when life's day is done"

—*Wordsworth.*

অনেকক্ষণ হইল, গোপাল খেলা করিতে গিয়াছে। বেলা দেড় প্রহর অতীত হইতে চলিল; অথচ, গোপাল বাড়ী ফিরিল না! গোপালের মা বড়ই চিন্তান্বিতা হইলেন।

গোপালকে খুঁজিতে গিয়া রাখালও আর ফিরিয়া আসিল না দেখিয়া, তিনি বিশেষ একটু চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। পদ্মমণিকে ডাকিয়া গোপালের অনুসন্ধান করিতে কহিলেন। পদ্মমণি—রায়-পরিবারে দাসীবৃত্তি করে।

পদ্মমণি—আট গ্রামেরই এক সদ্গোপের কন্যা। আকৃতি—নাতি-স্থূল, নাতি-দীর্ঘ; বর্ণ—ঘনকৃষ্ণ; দাঁত প্রায়ই পড়িয়া গিয়াছে; চুলগুলি কতক পাকিয়াছে, কতক পাক ধরিয়াছে। বয়স পঞ্চাশ উত্তীর্ণপ্রায়। দেখিলে, বয়স আরও বেশী বলিয়া মনে হয়। কিন্তু পদ্মমণি তত বয়সের কথা স্বীকার করে না। বয়সের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সে কত কথাই বলে! বলে—"আমার আর কিসের বয়স? অদেষ্ট মন্দ, তাই আমায় এ বয়সে দাসীবৃত্তি কর্‌তে হ'চ্ছে। নইলে তাঁর কি এখন ম'রবার সময় হ'য়েছিল?"

পাঁচ বৎসর হইল, পদ্মমণির স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু পদ্মমণি মনে করে—'সে যেন বাল-বিধবা, সে অতি নিষ্ঠাবতী, তার মত সাধ্বী-সতী—বামুনের ঘরে মেলাও সুকঠিন। কঠোরতা-পালনে ব্রাহ্মণ-বিধবাও তাহার সমকক্ষ নহে।'

যতটা মনে করে, ততটা না হউক, পদ্মমণি অনেক পরিমাণে ব্রাহ্মণ-বিধবারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলে। বার-ব্রত পালন, পূজা-উপবাস প্রভৃতিতে তাহার উৎকট আগ্রহ। তাহাতে সময়ে সময়ে সে মনিবের আদেশ পর্য্যন্ত অমান্য করিয়া বসে। কিন্তু তাহার নানা গুণের কথা স্মরণ করিয়া, রায়-পরিবারের কেহই পদ্মমণির প্রতি কখনও অসন্তুষ্ট হন না। পদ্মমণি কত সময় মনিবের মুখের উপর উত্তর দেয়, কত সময় কত কাজ 'পারিব না' বলিয়া অগ্রাহ্য করে; তথাপি তাহার প্রতি মনিব বিরূপ নহেন। পদ্মমণির একটী গুণ—মিষ্ট মুখে বলিলে পদ্মমণি বাঘের মুখে যাইতে পারে। কিন্তু মুখ বাঁকাইয়া তাহাকে কেহ যদি সন্দেশ খাইতে বলেন, পদ্মমণি তাহা স্পর্শও করে না।

গোপালের মা বলিলেন,—"যা না পদ্ম! একবার দেখে আয় না—গোপাল আমার কোথায় গেল?"

পদ্মমণি প্রথমবার যেন শুনিতেই পাইল না! দ্বিতীয় বারে উত্তর দিল,—"কোথায় আর যাবে বাছা! পাড়ার মধ্যেই খেলা ক'র্‌ছে; এখনই ফিরে আস্‌বে।" এই বলিয়া উত্তর দিয়া পদ্মমণি গোয়াল-ঘরে প্রবেশ করিল।

গোপালের মা একবারের অধিক দুইবার প্রায়ই কাহাকেও কোনও কথা বলেন না। একবারও যাহা বলেন, তাহাও অতি মিষ্ট স্বরে। তাঁহার নাম—শান্তি। তিনি যেন মূর্ত্তিমতী শান্তি; তাঁহার কথাবার্ত্তাও শান্তি-পূর্ণ। আজ যে তিনি দুই বার পদ্মমণিকে অনুরোধ করিলেন, তাহার কারণ—গোপালের সম্বন্ধে মন বড়ই চঞ্চল হইয়াছিল। কিন্তু দুই বার

বলায়ও পদ্মমণি যখন তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না, তখন তিনি কুমুদিনী দেব্যার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই কুমুদিনী দেব্যাও স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। কুমুদিনী দেব্যা—হরিদেব রায়ের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী। খাজুরা গ্রামে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। পতির মৃত্যুর পর, তিনি এখন ভ্রাতার সংসারে আসিয়া অবস্থিত করিতেছেন। তিনিই এখন সে সংসারের কর্ত্রী-স্বরূপিণী।

কুমুদিনীকে স্নান করিয়া ফিরিতে দেখিয়া, গোপালের মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ঠাকুরঝি! গোপালকে রাস্তায় দেখ্‌লে কি? গোপাল যে অনেকক্ষণ বাড়ী আসে নি।"

কুমুদিনী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সেই গিয়েছে, এখনও ফেরে-নি? তা যাক্ না—পদ্ম গিয়ে একবার খুঁজে নিয়ে আসুক না!"

গোপালের মা। আমিও তাই বল্‌ছিলাম।

গোয়াল-ঘর হইতে একটা ঝুড়ি হাতে করিয়া পদ্মমণি বাহিরে আসিল। সে গোয়াল-ঘরে ছাই ছড়াইয়া দিতে গিয়াছিল।

কুমুদিনী পদ্মমণিকে বলিলেন,—"যা না পদ্ম! দেখেই আয় না একবার!"

পদ্মমণি উত্তর দিল,—"তোমাদের বাছা, সদাই হারাই হারাই! গোপাল খেল্‌া ক'র্‌তে গিয়েছে, এখনই বাড়ী আস্‌বে। তার জন্যে আর এত ভাবনা কেন? আমি কাজ কর্ম্ম আগে সেরে নিই। তখনও না আসে; তার পর গিয়ে ডেকে নিয়ে আস্‌ব।"

বলিতে বলিতে অকস্মাৎ গোপাল আসিয়া গৃহে উপস্থিত হইল। সঙ্গে গোপালের পিতা হরিদেব রায়। তিনি গোপালের হাত ধরিয়া গোপালকে লইয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

হরিদেব রায়ের হস্তধারণ করিয়া গোপালকে বাড়ী আসিতে দেখিয়া,

পদ্মমণি টিট্‌কারী দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল; বলিল,—"গোপাল—গোপাল—গোপাল! ঐ গোপাল এয়েছে। তোমাদের যেমন বাছা সদাই হারাই হারাই! ঐ দেখ! বাবার সঙ্গে গোপাল আস্‌ছে।"

তিন দিন হইল, হরিদেব রায় চৌগ্রামের চৌধুরী বাড়ীতে নিমন্ত্রণ উপলক্ষে গমন করিয়াছিলেন। গোপালের অগ্রজ দুই জন তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিল। তাহাদের নাম—ভবানীপ্রসাদ ও রামপ্রসাদ। হরিদেব রায় ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু ভবানীপ্রসাদ ও রামপ্রসাদ ফিরিয়া আসিল না। কুমুদিনী দেব্যা তাই কনিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হাঁরে হরি! ভবানী আর রাম এল না কেন?"

হরিদেব। তারা সেখান থেকে মামার বাড়ী গেল। তাদেরও আগ্রহ, চৌধুরী মহাশয়ও ছাড়লেন না। আমাকেও বড়ই অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু বিশেষ কার্য্যের জন্য আমার যাওয়া হ'ল না। গোপালকে সঙ্গে ক'রে কাল আমার নাটোর যাবার প্রয়োজন আছে।

গোপালকে সঙ্গে লইয়া নাটোর যাওয়ার প্রস্তাব শুনিয়া, শান্তিদেবীর প্রাণে যেন কি এক দুর্ভাবনা আসিয়া উপস্থিত হইল। কুমুদিনী-দেব্যার সম্মুখে তিনি স্বামীর সহিত কথা কহিতেন না; সেকালে সেরূপ প্রথাও ছিল না; সুতরাং গোপালকে সঙ্গে করিয়া হঠাৎ নাটোর যাইবার কারণ কি—তাহা জানিবার জন্য একান্ত আগ্রহ হইলেও প্রকাশ্যে তাহা ব্যক্ত করিতে পারিলেন না। কুমুদিনী দেব্যাও তাড়াতাড়িতে সে বিষয়ে কোন প্রশ্ন করিলেন না।

হরিদেব রায় বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেলেন। ভৃত্য শ্যামচাঁদ তাঁহার ধূম-পানের আয়োজন করিতে লাগিল। পদ্মমণি পদপ্রক্ষালনের জল দিয়া আসিল। এই সময় রাখাল, আপনার পাখীটিকে বাড়ীতে রাখিয়া, গোপালের পাখীর কথা গোপালের মাতাকে বলিতে আসিয়াছিল।

অবসর বুঝিয়া, শান্তিদেবীকে লক্ষ্য করিয়া, রাখাল বলিয়া উঠিল,—"শুনেছ কাকি-মা! পয়সা দিয়ে পাখী কিনে, গোপাল সেই পাখীটিকে উড়িয়ে দিয়েছে!"

পদ্মমণি আগবাড়া হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হারে গোপাল! সত্যি নাকি?"

কুমুদিনী দেব্যা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সকালে যে তোকে পয়সা দিয়েছিলেম, সে পয়সা কি ক'রলি?

গোপাল কোনই উত্তর দিল না; অধোবদনে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। গোপালকে ক্রোড়ের নিকট টানিয়া লইয়া শান্তিদেবী কহিলেন,—"সত্যি নাকি গোপাল! পয়সাটা নষ্ট ক'রেছিস্?"

জননীর মুখপানে চাহিয়া গোপাল উত্তর করিল,—"না—মা! আমি তো পয়সা নষ্ট করি-নি!"

রাখাল বাধা দিয়া কহিল,—"না—তুই পয়সা নষ্ট করিস্‌নি? আমি দেখ্‌লাম—তুই পয়সা দিয়ে পাখী কিন্‌লি! তোর সে পাখী গেল কোথায়?"

পদ্মমণি বলিল,—"রাখাল কি তবে মিছে কথা ব'ল্‌ছে!"

এই বলিয়াই পদ্মমণি পুনরায় গোয়াল-ঘরের দিকে গমন করিল। "ছেলে বড় বদ্ হ'য়েছে"—এই কথা বলিয়া কুমুদিনী দেব্যাও কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

শান্তিদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা গোপাল! কি হ'য়েছিল, বল দেখি? পয়সা নষ্ট করিস্-নি—বলছিস্; আবার দেখ্‌ছি—তোর কাছে পয়সাও নেই! তবে সে পয়সা তুই কি ক'র্‌লি?"

গোপাল ধীরে ধীরে উত্তর দিল,—"পয়সা নষ্ট করি-নি—মা! পয়সায় একটী প্রাণীর বন্ধন মুক্ত করেছি!"

জননী কিছুই বুঝিতে পারিলেন না! 'একটী প্রাণীর বন্ধন মুক্ত ক'রেছি,—গোপাল এ কি বলে?' জননী কহিলেন,—"বুঝেছি, পাখীটা তোর হাত থেকে পালিয়ে গিয়েছে।"

গোপাল। না—মা! পাখী তো পালিয়ে যায়-নি? আমিই পাখীটাকে উড়িয়ে দিয়েছি। পাখী ব্যাধের বন্ধনে আবদ্ধ ছিল; আমি তাকে মুক্ত ক'রেছি!

শান্তি। তুই এ কি ব'ল্‌ছিস? এ কথা তোকে কে শিখিয়ে দিলে?

গোপাল। শিখিয়েছেন সেই সন্ন্যাসী ঠাকুর। তিনি বলেন,—যারা অনন্ত আকাশের উন্মুক্ত বায়ুতে বিচরণ করে, তাদের ক্ষুদ্র পিঞ্জরে বদ্ধ ক'রে রাখা—মহাপাপ। আমি তাই পাখীটার বন্ধন মোচন ক'রেছি। মা! তিনি ব'লেছেন,—"বন্ধনই সর্ব্ব দুঃখের মূল, বন্ধন মোচনই পরম সুখ!"

গোপাল তোতা পাখীর ন্যায় কথাগুলি বলিয়া গেল। কিন্তু মায়ের প্রাণে কথাগুলি বিষবৎ বিদ্ধ হইল। শান্তিদেবী গোপালের মুখ-চুম্বন করিয়া বলিলেন,—"যা হ'য়েছে—হ'য়েছে। তা—অমন ক'রে আর পয়সা নষ্ট ক'র না—বাবা!"

প্রকাশ্যে তিনি এই কথাই বলিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার মনোমধ্যে এক দারুণ দুর্ভাবনা উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—"বন্ধন-মোচন! জানি না—গোপালের মনে কি আছে!" তিনি কর-যোড়ে ভগবানকে ডাকিলেন,—ভগবান! তুমি গোপালের সুমতি দিও! গোপাল তোমারই পদাশ্রিত!"

জননীর কথায় গোপাল কোনও উত্তর দিল না; কিন্তু মনে মনে বলিল,—"যদি পয়সা কখনও পাই, বন্ধন-মোচনই আমার লক্ষ্য থাকিবে।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

——o——

স্বামিসকাশে।

"But had no hearts to break his purposes."

—*Tennyson.*

দিন কাটিল। রাত্রি আসিল। পতি-পত্নীতে সাক্ষাৎ হইল।

শান্তিদেবীর প্রাণ উদ্বেগ-পূর্ণ। গোপালকে সঙ্গে লইয়া রজনী-প্রভাতে স্বামী নাটোর-যাত্রা করিবেন শুনিয়া অবধি তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। এ দিকে আবার সন্ন্যাসীর সহিত গোপালের সাক্ষাৎ-কারের সমাচারে এবং গোপালের মুখে 'বন্ধন-মোচনই পরম সুখ' এবম্বিধ ঔদাসীন্যব্যঞ্জক উক্তি শ্রবণ করিয়া, তাঁহার চঞ্চল চিত্তের চিন্তা-বহ্নিতে যেন ইন্ধন সংযুক্ত হইয়াছিল।

পতিকে প্রকোষ্ঠে পাইয়া, তাই প্রথমেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,— "গোপালের কথা সব শুনেছেন কি?"

হরিদেব রায় উত্তর দিলেন,—"পাগল ছেলের পাগলামির কথা আর কি শুন্‌ব?"

শান্তিদেবী। সন্ন্যাসীর সহিত গোপালের সাক্ষাৎ হওয়া অবধি গোপালকে কেমন যেন আমি আন্‌মনা দেখ্‌ছি। আমার মনে কত যেন কি আশঙ্কার কথা উদয় হ'চ্ছে! কপালে কি আছে, কে ব'ল্‌তে পারে!

হরিদেব। সামান্যতেই তুমি বিচলিত হও। ছেলে মানুষের সব কথা কি ধ'র্‌তে আছে ?

"কথাটা শুনেই প্রাণটা কেমন চম্‌কে উঠ্‌ল, তাই বল্‌ছিলাম।" এই বলিয়া শান্তিদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা, কাল আপনি গোপালকে নিয়ে নাটোরে যাবেন—বল্‌ছিলেন না ?—কেন ?"

হরিদেব রায় উত্তর করিলেন,—"তুমি শোন-নি কি—মহারাণী ভবানী পোষ্যপুত্র গ্রহণ ক'র্‌বেন ? তাঁর দেওয়ান দয়ারাম রায়ের সহিত আমার সাক্ষাৎ হ'য়েছিল। তিনি গোপালকে নিয়ে আমায় নাটোরে যেতে ব'লেছেন। এদিকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ উপলক্ষে নাটোর রাজবাড়ী থেকে নিমন্ত্রণ-পত্রও এসেছে।"

শান্তিদেবী। নিমন্ত্রণ রক্ষে কর্‌তে আপনি যাবেন ; তা গোপালের যাওয়ার আবশ্যক কি ? দেওয়ানই বা গোপালকে নিয়ে যেতে ব'ল্‌লেন কেন ?

হরিদেব। বিশেষ একটু উদ্দেশ্য আছে। মহারাণী ভবানীর যদি নজরে লাগে, তা হ'লে গোপাল আমার অর্দ্ধবঙ্গেশ্বর হ'তে পার্‌বে।

কথাটা শুনিয়া, শান্তিদেবীর প্রাণটা যেন কেমন-কেমন করিয়া উঠিল। শান্তিদেবী কহিলেন,—"আপনি কি ব'ল্‌ছেন, আমি কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে !"

হরিদেব রায় কহিলেন,—"আমার গোপাল যেরূপ সুলক্ষণাক্রান্ত, গোপালকে দে'খে নিশ্চয়ই মহারাণীর পছন্দ হবে।"

শান্তিদেবী। নাটোর যাবেন ব'লেই বুঝি, ভবানীপ্রসাদ ও রাম-প্রসাদের সঙ্গে আমার পিত্রালয়ে না গিয়ে, আপনি তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে এসেছেন ?

হরিদেব। হাঁ, তাই বটে ! গোপাল আমার সঙ্গে থাকুক আমি

ঐ পথেই নাটোর রওনা হ'তাম। দিন সংক্ষেপ ; তাই কালই আমায় রওনা হ'তে হবে। গোপালকে নেবার জন্যই আমি বাড়ী এসেছি।

শান্তিদেবী। আপনি কি তবে মনে ক'রেছেন, গোপালকে আপনি দত্তক পুত্র দিবেন ? আমার প্রাণ থাক্‌তে আমি তা দিতে পার্‌ব না।

হরিদেব। তুমি বুঝ্‌ছ না ! গোপাল রাজা হ'বে ; আমরা অতুল সম্পত্তির অধিকারী হ'ব। একি অল্প সৌভাগ্যের কথা ! ভগবান যদি মুখ তুলে চান, তবেই সে সৌভাগ্যের দিন আস্‌তে পারে।

শান্তিদেবী। তেমন সৌভাগ্য আমি চাই না ! গোপালকে আমি কিছুতেই ছেড়ে দিতে পার্‌ব না। আপনি যাই বলুন, গোপালের নাটোর যাওয়া হ'বে না।

হরিদেব। সে কি বল ? আমি যে যাওয়ার সব বন্দোবস্ত ক'রেছি ! সকালে পাল্কী আস্‌বে ; আমি গোপালকে নিয়ে নাটোর যা'ব !

শান্তিদেব ! আপনি যাবেন—যান ; গোপালকে আমি কিছুতেই যেতে দেব না !

হরিদেব রায় একটু বিরক্ত হইলেন। কিন্তু সে ভাব প্রকাশ না করিয়া স্ত্রীকে বুঝাইবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। বুঝাইলেন,—নাটোরের ঐশ্বর্য্যের কথা ; বুঝাইলেন,—গোপাল পোষ্যপুত্র মনোনীত হইলে, গোপাল সেই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইবে ; বুঝাইলেন,—গোপাল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলে, তাঁদের দিন ফিরিয়া যাইবে।

কিন্তু শান্তিদেবীর মন কিছুতেই প্রবোধ মানিল না। ভবিষ্যতের কি যেন অমঙ্গল-ছায়া ঘনীভূত হইয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। তিনি বলিলেন,—"আপনি যতই প্রবোধ দেন, আমার মন কিছুতেই প্রবোধ মান্‌ছে না !"

হরিদেব রায় পুনরপি কহিলেন,—"গোপালকে যে আমি সেখানে রেখে

আস্‌তেই নিয়ে যাচ্ছি, তা তুমি মনে ক'র না। গোপালের ন্যায় শত শত বালক সেখানে উপস্থিত হবে। তাদের মধ্যে যে বালক মহারাণীর নজরে পড়্‌বে, মহারাণী তা'কেই পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ ক'র্‌বেন। শত বালকের মধ্যে গোপালকে যে তিনি পছন্দ ক'র্‌বেন, সে আশা দুরাশা মাত্র!"

শান্তিদেবী সুযোগ পাইলেন। মনে মনে বলিলেন,—"ভগবান করুন, সে আশা দুরাশাই হউক!" প্রকাশ্যে কহিলেন,—"তবে আর আপনি গোপালকে নিয়ে যাবার জন্য এত আগ্রহ প্রকাশ ক'র্‌ছেন কেন?"

হরিদেব। তার কারণ অন্যরূপ। মহারাণী ঘোষণা ক'রেছেন, যাঁ'র পুত্র মনোনীত নাও হ'বে, পুত্র সহ রাজধানীতে গমন ক'র্‌লে, তিনিও যথেষ্ট বিদায়-সম্মান প্রাপ্ত হ'বেন। এমন কি, তৎসূত্রে একটা বিষয়-সম্পত্তি পর্য্যন্ত পাওয়া যেতে পারে। তার পর, আমাদের ভাগ্য যদি প্রসন্ন হয়, গোপালকেই যদি মহারাণী পছন্দ করেন, তা'হলে তো আর কথাই নেই!

শান্তিদেবী। তেমন ভাগ্য-প্রসন্ন হওয়ার আমার দরকার নেই;— তেমন বিষয়েও আমি আকাঙ্ক্ষা করি-নে।

হরিদেব। ঈশ্বরেচ্ছায় আমাদের তিনটি পুত্র-সন্তান। তার একটীকে দত্তক দিয়ে আমরা যদি অতুল সম্পত্তির অধিকারী হ'তে পারি, সে কি বাঞ্ছনীয় নয়?

কথাটা শান্তিদেবীর প্রাণের ভিতর শেল-সম বিদ্ধ হইল। তিনি উত্তেজিত:কণ্ঠে কহিলেন,—"না—না! কখনই বাঞ্ছনীয় নয়! যার দু'টী চক্ষু আছে, সে কি একটী চক্ষু উৎপাটন ক'রে দিতে পারে? যার দুইখানি হাত, সে কি এক খানি হাত কেটে দিতে সম্মত হয়? আপনি আমায় এ কি প্রলোভন দেখাচ্ছেন! পুত্রের বিনিময়ে সম্পত্তি-লাভ! তেমন সম্পত্তিতে আমার কাজ নেই! ঈশ্বর না করুন, যদি তেমন দুর্দ্দশার দিনই আসে, না

হয়—স্বামী-স্ত্রীতে দু'জনে ভিক্ষা ক'রে নিয়ে এসে সন্তান তিনটীকে পালন ক'র্‌ব ; কিন্তু পরের হাতে কোন মতেই সমর্পণ ক'র্‌তে পার্‌ব না।"

শান্তিদেবীর দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা নিপতিত হইতে লাগিল।

পত্নী অতিমাত্র বিচলিত হইয়াছেন বুঝিয়া, হরিদেব রায় ধীরে কহিলেন, —"আচ্ছা, আমি তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা ক'র্‌ছি, আমি গোপালকে সেখানে রেখে আস্‌ব না। মহারাণী যদিও গোপালকে পছন্দ করেন, আমি তবু গোপালকে বাড়ী ফিরে নিয়ে আস্‌ব। বাড়ী ফিরে নিয়ে এলে, তার পর যদি তোমার ইচ্ছা হয়, গোপালকে পাঠিয়ে দিও ; না হয়, না পাঠিও।"

শান্তিদেবী অশ্রু-গদগদ কণ্ঠে কহিলেন,—"তবে নিয়ে যাওয়ার কি প্রয়োজন?"

হরিদেব। আমি যে কথা দিয়েছি! একবার না নিয়ে গেলে আমার যে কথার খেলাপ হ'বে!

শান্তিদেবী বিবেচনা করিবার অবসর পাইলেন না। তিনি উদ্বেগ-বশে বলিয়া উঠিলেন,—"হয়—হবে!"

হরিদেব। কথার খেলাপ হ'লে ইহলোকে ও পরলোকে কষ্ট পেতে হ'বে। তুমি ধর্ম্মপরায়ণা, তুমি বুদ্ধিমতী ; সহধর্ম্মিণী হ'য়ে, তুমি কি আমায় পাপ-পঙ্কে নিমজ্জিত হ'তে পরামর্শ দেও!

শান্তিদেবী সঙ্কুচিতা হইলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল,—তিনি যেন কত অপরাধই করিয়া বসিয়াছেন! তখন কত কথাই তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল! পতির কথায় প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাঁহার প্রাণে ব্যথা দিয়াছেন,—তজ্জন্য কতই অনুতাপ হইল। একে পুত্রত্যাগের আশঙ্কা, তাহার উপর পতির অসন্তোষ-উৎপাদন-জনিত অনুতাপ,—এতদুভয়ে তাঁহার হৃদয় অভিভূত করিয়া ফেলিল।

কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর চরণ-প্রান্তে নিপতিত হইয়া শান্তিদেবী কহিলেন,—"আমার অপরাধ লইবেন না। আপনি যা ভাল বোঝেন, তাই করুন। তবে আমার একটী অনুরোধ—আমার গোপালকে আপনি কোনমতেই সেখানে রেখে আস্‌বেন না!"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—o—

লোভ।

"লোভাৎ ক্রোধঃ প্রভবতি লোভাৎ কামঃ প্রজায়তে।
লোভান্মোহশ্চ নাশশ্চ লোভঃ পাপস্য কারণম্‌॥"

—হিতোপদেশ।

মহারাণী ভবানী পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবেন,—এই সংবাদে কেবল যে হরিদেব রায়ের সংসার উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা নহে; বাঙ্গালার আরও বহু গৃহ এই আন্দোলনে আন্দোলিত।

কৃষ্ণনাথ রায়ের দুই পুত্র। অবস্থা তাদৃশ স্বচ্ছল নহে। সুতরাং তিনি একটী পুত্রকে নাটোর-রাজধানীতে লইয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। পত্নী মহামায়ার সহিত কয় দিন ধরিয়া সেই সম্বন্ধেই পরামর্শ চলিতেছে।

কৃষ্ণনাথ বলিতেছেন,—"অনেক লোক অনেক ছেলে-পিলে নিয়ে যাবে ; কত লোকের কত রকম সুপারিশ পড়্‌বে ; আমরা এমন কি অদৃষ্ট ক'রেছি যে, রঘুনাথের প্রতিই মহারাণীর নজর পড়্‌বে !"

মহামায়া। তাইতেই তো আমি দু'দিন আগে নিয়ে যেতে ব'ল্‌ছি। প্রথমে যদি একবার নজরে পড়ে যায়, মহারাণীর নিশ্চয়ই পছন্দ হবে। আমি বলি, তুমি কালই নাটোর রওনা হও।

কৃষ্ণনাথ। আগে কি তিনি দেখ্‌বেন ? আমি শুনেছি, যত দেশ থেকে যত ছেলে যাবে, সবগুলিকে এক সঙ্গে বসিয়ে রেখে, মহারাণী তারই মধ্যের একজনকে পোষ্যপুত্র মনোনয়ন করবেন।

মহামায়া। আগে নিয়ে গিয়ে কোনরকমে তাঁকে একবার দেখাতে পার্‌বে না ? রাজবাড়ীর মধ্যে তুমি নিজে না যেতে পা'র, রাজবাড়ীর ঝি-চাকরের সঙ্গে বন্দোবস্ত ক'রেও তো রঘুনাথকে বাড়ীর মধ্যে পাঠিয়ে দিতে পার! এর জন্যে তাদের কিছু দিতে হয়, সেও ভাল। আমার রঘুনাথ দেখ্‌তে যেরূপ সুন্দর, তাকে দেখ্‌লে মহারাণী কখনই অপছন্দ কর্‌বেন না। যেমন ক'রেই হ'ক, তুমি রঘুনাথকে নিয়ে গিয়ে মহারাণীর সাম্‌নে একবার উপস্থিত কর্‌বার ব্যবস্থা ক'রো। দিন থাক্‌তে যাও ; বন্দোবস্ত নিশ্চয়ই করতে পার্‌বে।

কৃষ্ণনাথ। চেষ্টার ত্রুটি ক'র্‌ব না। রঘুনাথকে যাতে রেখে আস্‌তে পারি, তাই ক'র্‌ব। ভাল কালই আমি রওনা হব।

মহামায়া ভাবিতে লাগিলেন,—'রঘুনাথ রাজা হবে ; আমাদের সকল দুঃখ দূরে যাবে ; আমরা রাজৈশ্বর্য্যের অধিকারী হব,—এর বাড়া আহ্লাদের কথা আর কি হ'তে পারে ?' প্রকাশ্যে কহিলেন,—"যেমন ক'রে হ'ক, তুমি রঘুনাথকে নজরে লাগাবার চেষ্টা ক'রো।"

তাহাই স্থির হইল! পরদিন প্রত্যূষে, রঘুনাথকে সঙ্গে লইয়া,

কৃষ্ণনাথ নাটোর যাত্রা করিবেন, বন্দোবস্ত হইয়া গেল। পিতামাতা উভয়েরই মনে কত আশা, কত ভরসা—রঘুনাথকে পোষ্যপুত্ররূপে প্রদান করিয়া আপনাদের অবস্থা ফিরাইয়া লইবেন।

কৃষ্ণনাথ মনে মনে কহিলেন,—'অর্থ! তুমিই সার। অর্থে সকলই হয়।'

মহামায়ার হৃদয়েও প্রতিধ্বনি উঠিল,—'অর্থ! অর্থই সার! অর্থে সকলই হইতে পারে।'

পতি পত্নী উভয়েই অর্থলালসায় ব্যাকুল হইয়া প্রাণপ্রিয় পুত্র রঘুনাথকে বিদায় দিতে প্রস্তুত হইলেন।

* * *

পরদিন প্রভাতে নাটোর-যাত্রার সময় রঘুনাথ কাঁদিয়া উঠিল। পিতা বুঝাইতেছেন,—'নাটোরে নিমন্ত্রণে যাইবে।' মাতা বুঝাইতেছেন,—'কত ভাল ভাল খাবার পাবে, কত ভাল ভাল পোষাক পাবে, কত টাকাকড়ি পাবে; যাও বাবা—যাও।'

কিন্তু বালক যাইতে চাহে না। কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে,—"না—মা, আমি যাব না। না—বাবা, আমি যাব না। আমি খাবার চাই না, আমি পোষাক চাই না, আমি টাকা-কড়িও চাই না।"

কৃষ্ণনাথ ও মহামায়া সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহারা একবার বা তিরস্কার-ছলে, একবার বা প্রবোধ বাক্যে, রঘুনাথকে নাটোর-যাত্রায় উদ্বোধিত করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বাঙ্গালার অবস্থা।

"Let the dead Past bury its dead."
—Longfellow.

আমরা যে সময়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছি, বাঙ্গালার অবস্থা তখন বড়ই বিপ্লবময়। বাঙ্গালার রাজনৈতিক গগন তখন ঘনঘটাচ্ছন্ন। লোকপ্রিয় নবাব আলীবর্দ্দি ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তাঁহার আদর-প্রাপ্ত দৌহিত্র যুবক সিরাজউদ্দৌলা বঙ্গের মসনদ অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। বঙ্গ সিংহাসনের চতুঃপার্শ্বে ষড়যন্ত্র-জাল বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। সর্পপ্রকৃতি কুচক্রিগণ বিষ-জিহ্বা বিস্তার করিয়া আছে।

দেশ অরাজক। রাষ্ট্র-বিপ্লবের সূচনা পদে পদে প্রত্যক্ষীভূতা। দিকে দিকে অশান্তি-অনল প্রজ্বলিত। পরদার, পরস্বাপহরণ, দস্যুভীতি প্রভৃতিতে প্রজাবর্গ বিষম বিব্রত। দেশে হা-হুতাশ হাহাকার রাজত্ব করিতেছে। পূর্ব্বে দেখ, পশ্চিমে দেখ, উত্তরে দেখ, দক্ষিণে দেখ,—যে দিকে দেখিবে,—সেই দিকেই বিপ্লবের বিষম বিভীষিকা!

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের উপর দিয়া কি বিষম অশান্তি-প্রবাহই প্রবাহিত হইয়াছিল! এক দিকে ইংরেজ, এক দিকে ফরাসী,—এক দিকে মোগল, এক দিকে মহারাষ্ট্রীয়গণ,—এক দিকে নবাব, এক দিকে তাঁহার বিশ্বাস-ঘাতক পারিষদবর্গ,—আমিষলোভী মার্জ্জারের ন্যায় বঙ্গের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি

নিক্ষেপ করিয়া ছিলেন। বঙ্গ-লক্ষ্মী কোন্ দিন কোন্ ভাগ্যবানের গৃহ পবিত্র করিবেন,—কেহই তাহা নির্ণয় করিতে পারিতেছিলেন না। কেহ মনে করিতেছিলেন,—"নবাবের প্রবল প্রতাপ—বিপুল বাহিনী। যিনিই সম্মুখীন হইবেন, স্রোতে তৃণকণার ন্যায় ভাসিয়া যাইবেন।" কেহ মনে করিতেছিলেন,—"বিশ্বাস-ঘাতকদিগের ষড়যন্ত্র-রূপ প্রস্তর-স্তূপ সম্মুখে পড়িলে, সে স্রোতোবেগ আপনিই মন্দীভূত হইয়া আসিবে।" কেহ মনে করিতেছিলেন,—"আওরঙ্গজেব কথিত সেই 'পার্ব্বত্য মূষিক' মহারাষ্ট্রগণই কালে ভারতের একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ করিবে।" কেহ মনে করিতেছিলেন,—"দিন দিন অভ্যুত্থানশীল ফরাসী-জাতিই ভারত-সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইবে।" কেহ বা মনে করিতেছিলেন,—"দাক্ষিণাত্যে ক্লাইবের আকূট অবরোধে সকলের সকল আশাই দূরীভূত হইয়াছে। এখন ইংরেজের ললাট-লিপিতেই ভারতসাম্রাজ্য-লাভের পরিচয়-চিহ্ন পরিদৃশ্যমান্!"

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন পলাশী-প্রাঙ্গণে অদৃষ্ট-পরীক্ষার শেষ দিন। নবাবের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া, সৌভাগ্যলক্ষ্মী সেই দিন ইংরেজের গৃহ পবিত্র করেন। ইতিহাসে সে এক স্মরণীয় ঘটনা।

পলাশীর আম্রকাননে সামান্য কয়েক জন সৈন্য-সহ ক্লাইবের সমরায়োজন,—অগণিত সৈন্য লইয়াও মীরজাফর প্রমুখ প্রধান সেনাপতিগণের বিশ্বাস-ঘাতকতায় সিরাজের পরাজয়,—নবাবের পলায়ন ও তাঁহার নৃশংস হত্যাকাণ্ড,—জয়োল্লাসে ক্লাইবের মুর্শিদাবাদ প্রবেশ,—মীরজাফরের মসনদপ্রাপ্তি,—সকলেরই স্মৃতি-পটে উজ্জ্বল হইয়া আছে। পাঠক—সকলেই সে সমাচার অবগত আছেন। বাহুল্য-ভয়ে সে প্রসঙ্গ এখানে আর উত্থাপন করিলাম না।

শুনিয়াছি, এই পলাশী-যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে নাটোর-রাজধানীতে মহারাণী ভবানীর পোষ্য-পুত্র-গ্রহণের উদ্যোগ হইয়াছিল। শুনিয়াছি,

এই পলাশী-যুদ্ধের পরই মহারাণী ভবানীর পোষ্য-পুত্র-গ্রহণের উৎসব-সমারোহে নাটোর-রাজধানী মুখরিত হইয়াছিল। পলাশী-যুদ্ধের কয়েক দিন পূর্ব্বেই হউক, আর আর কয়েক দিন পরেই হউক, মহারাণী ভবানী যখন দত্তক গ্রহণ করেন;—বঙ্গদেশ তখন যে নানারূপে সঙ্কট-সমাকুল ছিল, তাহার প্রমাণাভাব নাই। ভাগীরথীর পূর্ব্ব উপকূল এবং পশ্চিম উপকূল—উভয় কূলেই তখন নানা উচ্ছৃঙ্খলা বিরাজমান ছিল,—তখনও মানুষ-চুরীর আতঙ্ক তিরোহিত হয় নাই,—তখনও ধর্ম্মনাশের বিভীষিকা দূরীভূত হয় নাই,—তখনও দস্যুতার সমাচার সর্ব্বদাই শ্রুতি-গোচর হইত। মহারাণী ভবানী আপন রাজ্য-মধ্যে শান্তি-স্থাপনে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিলেন বটে; কিন্তু পারিপার্শ্বিক উপদ্রবে তিনিও যে সময়ে সময়ে বিব্রত হইতেছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। যাহারা রক্ষক, সে সময়ে তাহারাই ভক্ষক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—o—

বিষম বিপদ!

'———সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে
ভীষণ-দর্শন মূর্ত্তি।"

—মেঘনাদ-বধ।

রূপ-নগরের প্রান্তভাগে কালাদীঘি নামে একটি জলাশয় ছিল। কালাদীঘির কাল-জলে তীরস্থিত তাল-তমাল তরুরাজির ছায়া, সুনীল গগনপ্রান্তে কৃষ্ণ-কাদম্বিনী-সম প্রকটিত হইতেছিল। বৈকালে,

মৃদুল-হিল্লোলে, সেই কৃষ্ণ-স্বচ্ছ সলিল-রাশি—নাচিতেছিল, দুলিতেছিল, খেলিতেছিল। কচিৎ বৃক্ষশাখাবিচ্ছেদপথ-প্রবিষ্ট আলোক-রশ্মি—সলিল-বক্ষে চকিত-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল ; কচিৎ দলবদ্ধ উড্ডীয়মান্ বিহঙ্গমের চঞ্চল-ছায়ায়—জলরাশির প্রশান্ত-বক্ষে কৃষ্ণ-রেখার সঞ্চার হইতেছিল ; কচিৎ দিবাবসানাশঙ্কায়, কুলায় অন্বেষণে, পক্ষিগণ কল-নিনাদে তীরভূমি ধ্বনিত করিতেছিল ; কচিৎ অদূরাগত সুন্দরীগণের কঙ্কণ-নিকণে মোহনে-মধুরে মিশিতেছিল।

দুইটী যুবতী সেই অপরাহ্নে কালাদীঘিতে গা ধুইতে আসিয়াছেন। তাঁহাদের সৌন্দর্য্যপ্রভায় কালাদীঘির কাল-জল যেন সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। সুনীল গগনে নক্ষত্র-পুঞ্জের শোভা-সদৃশ কিংবা সরোবর-প্রস্ফুটিত কমলদলের ন্যায়, আবক্ষ-নিমগ্না সেই সুন্দরীদ্বয়ের কমনীয় কান্তি সলিল-বক্ষে উদ্ভাসিত হইতেছিল। যুবতীদ্বয়, গাত্র-প্রক্ষালন-কালে কথোপকথনে গাঢ়-নিমগ্না ছিলেন। তাঁহাদের হস্তস্থিত কলসী, তরঙ্গ-ভঙ্গে হেলিতে দুলিতে নাচিতে নাচিতে ভাসিয়া যাইতেছিল। উন্মোচিত অবগুণ্ঠন বায়ুভরে সলিল-বক্ষে ক্রীড়া করিতেছিল। তরঙ্গ-বিচলিত জল-রাশি, বক্ষ উল্লঙ্ঘন করিয়া, কখনও গোলাপ-সন্নিভ সুকোমল গণ্ডদেশে, কখনও বা বেণীবদ্ধ কৃষ্ণ-কুন্তল-পাশে আসিয়া আঘাত করিতেছিল।

যুবতীদ্বয়ের একটীর নাম—তারা ; অপরটী—শ্যামা।

অপরাহ্নে কাসাদীঘিতে গা ধুইতে আসিয়া, নির্জ্জনতা পাইয়া, তাহারা দুই একটী প্রাণের কথা কহিতেছিল। কথায় কথায় তারা কহিল,—“তোর দাদা যখন গিয়েছেন, তখন নিশ্চয়ই নিয়ে আস্‌বেন!”

শ্যামা বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিল না। শ্যামা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উত্তর দিল,—“বউ! তেমন কপাল কি আমি ক’রেছি? তা’হলে [illegible] সংবাদ আস্‌বে কেন?”

তারা। আমার, কিন্তু ঠাকুর-ঝি! এ সংবাদে মোটেই বিশ্বাস হয় না।

শ্যামা। আমার অদৃষ্টে বউ, সব ঘট্‌তে পারে! নইলে, শ্বশুর মহাশয় বিরূপ হবেন কেন?

তারা। তালুই মহাশয় টাকার লোভে ঢ’লে পড়েছেন।

শ্যামা। তিনিই বা আস্‌বেন ব’লে গেলেন, আর এলেন না কেন?

তারা। হয় তো কোনও ঝঞ্ঝাটে প’ড়ে গিয়েছেন। আমার মনে হয়, তিনি শীঘ্রই আস্‌বেন। আমি যতদূর জানি, ঠাকুর-জামাই সে রকমের লোক নন।”

শ্যামা। তুমি তো বউ, আমার শ্বশুরকে জান না! তিনি একরোখা লোক;—যা ধ’র্‌বেন, তাই ক’র্‌বেন!

তারা। ঠাকুর-জামাই তাঁর মত ফেরাতে পার্‌বেন না!

শ্যামা। সাধ্য কি! বাপের নিকট মুখ তুলে কথাটি কইবারও তাঁর সামর্থ্য নেই!

তারা। আচ্ছা, তোমায় যে নিয়ে যাবার কথা হ’য়েছিল, তারই বা কি হ’ল?

শ্যামা। আর নিয়ে গিয়েছেন! এবার তিনি নূতন-বৌ নিয়ে ঘর ক’র্‌বেন। ভাই! সে বাড়ীতে আমার আর ঠাঁই নাই।

শ্যামা একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

তারার হাসি পাইল। সে হাসি চাপিয়া, তারা বলিল,—“তাই যদি হয়, তা তুই ভাব্‌ছিস্ কেন? ঠাকুর-জামাই যদি বিয়ে করে, তবে আমরাও আবার তোর বিয়ে দেব।”

শ্যামার একটু রাগ হইল। শ্যামা বলিল,—“সকল তাতেই তোর ঠাট্টা!”

তারা। তুই বুঝি মনে ক'র্লি, আমি ঠাট্টা কর্ছি! কেন, পুরুষেরই কি দু'দশবার বিয়ে কর্তে আছে, আর মেয়েদের বেলাতেই যত দোষ! আমি সত্যি ব'ল্ছি, ঠাকুর-জামাই যদি বিয়ে করে, তোর দাদাকে ব'লে, তোর জন্যে আমি কার্ত্তিকের মতন নূতন ঠাকুর-জামাই এনে দেব। কেমন —এখন ভাবনা দূর হ'ল তো?

শ্যামা। তুই কি ভাই আর ঠাট্টার সময় পেলি-নে? তাঁরা কুলীন; কুলীনে দু'শো একশো বিয়ে করে! শ্বশুর মহাশয় তাঁর ছেলের এক বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাক্‌বেন কি করে ভাই! এতদিন যে দু'দশটা বিয়ে দেন-নি, তাই আমার ভাগ্য বলে মান্‌তে হয়।

তারা। তুই রামও গাস্, আবার রহিমও গাস্। তবে করুন না কেন ঠাকুর-জামাই—আরও দু'দশটা বিয়ে! তার জন্যে তোর আর এত ভাবনা কেন?

আপনি বলিলে শোভা পায়; কিন্তু পরে বলিলে সহ্য হয় না;—মানুষের ইহাই প্রকৃতি। তারার কথায় শ্যামার হৃদয়ে বড়ই আঘাত লাগিল। শ্যামা উত্তর দিয়া এবার আর জিতিতে পারিল না। তাই সেই কাকচক্ষু-সন্নিভ কালাদীঘির কাল জলে শ্যামার দুই বিন্দু অশ্রুজল পতিত হইল।

শ্যামার নয়নাশ্রু-সম্পাতে তারার হৃদয় সহানুভূতিতে গলিয়া গেল। তারা সান্ত্বনাব্যঞ্জক স্বরে কহিল,—"ঠাকুর্-ঝি! তুই ক্ষেপেছিস্ নাকি? ঠাকুর-জামাই যে প্রকৃতির লোক, তিনি কি সহজে আর একটা বিয়ে ক'র্তে রাজি হ'বেন? তুই নিশ্চয় জানিস্, তিনি কখনই তা ক'র্বেন না।"

শ্যামা। সত্য ব'ল্তে কি বউ, সেই সাহসই আমার সাহস। তাঁর সেই সরল মুখখানি মনে প'ড়লে, একবারও মনে হয় না—তিনি কখনও আমায় ত্যাগ ক'র্তে পারেন।

বলিতে বলিতে শ্যামার নয়ন-কমল পুনরায় অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া আসিল।

শ্যামার মনের আবেগ উপলব্ধি করিয়া, তারা পুনরায় সান্ত্বনা-বাক্যে কহিল,—"ঠাকুর-ঝি! কেন তুই বৃথা ভাবনায় ব্যাকুল হ'স্! দাদা যখন গিয়েছেন, নিশ্চয়ই সে বিয়ে ভাঙ্গিয়ে আস্‌বেন। তুই দেখিস্—ঠাকুর-জামাইকে সঙ্গে নিয়ে তিনি শীঘ্রই এখানে এসে পৌছিবেন! তুই একটুও ভাবিস্ না।"

শ্যামা। বউ, তাই হোক—তোর মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক! যদি একবার তাঁর দেখা পাই, তাঁরে মিনতি ক'রে ব'ল্‌ব—

শ্যামা আর বলিতে পারিল না। শ্যামার বক্ষ বহিয়া অনুরাগের অশ্রুবিন্দু পতিত হইল। তারা নানারূপে তাহাকে বুঝাইতে লাগিল। কিন্তু শ্যামার উদ্বেগ-আতঙ্কপূর্ণ প্রাণ প্রবোধ মানিল না।

কথায় কথায় অনেক সময় কাটিয়া গেল। সম-বয়সী সাথী না হইলে, সকলের তো আর যোগ দেওয়া শোভা পায় না! সুতরাং শ্যামা ও তারার কথায়, শ্যামা ও তারাই বিভোর হইয়া রহিল। আর আর যাহারা ঘাটে গা ধুইতে আসিয়াছিল, তাহারা পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছিল।

শ্যামার আশঙ্কা দূর হইল না। তারা বুঝাইয়া বুঝাইয়া শ্যামার আতঙ্ক দূর করিতে পারিল না। সন্ধ্যার পদ-বিক্ষেপে পৃথিবীতে আঁধার-ব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে, নব নব আশঙ্কায়, শ্যামার প্রাণ ক্রমে নৈরাশ্যের গাঢ় অন্ধকারে নিমগ্ন হইতে লাগিল।

এদিকে গোধূলি অপগমে সন্ধ্যার সমাগম প্রত্যক্ষ করিয়া, তারা শ্যামাকে কহিল,—"সন্ধ্যা হ'য়ে এল। আয় ভাই বাড়ী যাওয়া যাক্।"

প্রকৃতি নিস্তব্ধ। কালাদীঘি নিস্তব্ধ। তীরস্থিত তরুরাজি নিস্তব্ধ। ক্বচিৎ বৃক্ষান্তরালে দুই একটী পাখীর কিচিমিচি শুনা যাইতেছে। ক্বচিৎ

দুই একটী নিশাচর পক্ষী বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে উড়িয়া বসিতেছে। ক্বচিৎ ঝিল্লিরবে এক এক প্রান্ত মুখরিত হইয়া উঠিতেছে।

তারার কথায় শ্যামার যেন চৈতন্যোদয় হইল। ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিয়া, উভয়েই মনে মনে ভয় পাইল। তখন আর বিলম্ব করা সঙ্গত নহে বুঝিয়া, গৃহ-গমনে প্রস্তুত হইল; ঘাট হইতে উঠিয়া, দীঘির পশ্চিম-পাড়ের পথ ধরিয়া, ধীরে ধীরে কলসী-কক্ষে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল।

কালাদীঘির সম্মুখে বিস্তৃত প্রান্তর। সেই প্রান্তর-মধ্যবর্ত্তী পথ অতিক্রম করিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইলে, গ্রামের মধ্যে পৌছান যায়; কিন্তু ঘাট হইতে উঠিয়া পথে পদার্পণ করিতেই—এ কি বিঘ্ন!

দুইজন সৈনিক পুরুষ সেই পথ দিয়া অশ্বারোহণে গমন করিতেছিল; সন্ধ্যার প্রাক্কালে, প্রান্তরের মধ্যে, কালাদীঘির কাল-জলে প্রস্ফুট-কমল-সদৃশ যুবতীদ্বয়কে দেখিতে পাইয়া, তাহারা অশ্বের গতি সংযত করিল।

সহসা সম্মুখে দুই জন অশ্বারোহী সৈনিক-পুরুষ আসিয়া পথ অবরুদ্ধ করায়, যুবতীদ্বয় চমকিয়া উঠিল। প্রথমে তাহারা সঙ্কুচিত হইয়া ঘাটের দিকে ফিরিয়া আসিবার চেষ্টা পাইল। কিন্তু যখন দেখিল, অশ্বারোহী সৈনিক-পুরুষদ্বয় তাহাদিগের অনুসরণ করিতেছে,—তাহাদিগের গতিরোধে চেষ্টা পাইতেছে; তখন আর তাহাদের আতঙ্কের অবধি রহিল না, তখন আর তাহারা অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিল না, তখন আর তাহাদের চরণ চলিতে চাহিল না। কক্ষের কলসী কক্ষভ্রষ্ট হইয়া ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইল। শরীর থর থর কাঁপিতে লাগিল।

সৈনিক-পুরুষদ্বয় মুসলমান। দুই জনেরই বেশ-ভূষা একরূপ। দুই জনেই একই প্রকার অশ্বে আরোহণ করিয়া ছিল। তাহারা নবাবের অনুচর। এক জনের নাম—আলিজান; অন্য জনের নাম—মহম্মদীবেগ।

যুবতীদ্বয়কে সঙ্কুচিত দেখিয়া, মহম্মদীবেগ বলিয়া উঠিল,—"তোমাদের ভয় নেই! আমাদের দ্বারা ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্ট হ'বে না।"

আলিজান বলিল,—"তোমাদের সৌভাগ্য, তাই আমাদের নজরে প'ড়ে গিয়েছ! খোদা এবার তোমাদের দুঃখ দূর ক'র্‌বেন।"

এই বলিয়া, সৈনিক-পুরুষদ্বয় অশ্ব হইতে অবতরণ করিল। দীঘির পাড়ে, একটী বৃক্ষের শাখায়, অশ্বদ্বয়কে বাঁধিয়া রাখিল। তার পর দুই জনে যুবতীদ্বয়কে ধরিতে গেল। বলিল,—"এস বিবিরা—এস! এস—বিনা আপত্তিতে আমাদের সঙ্গে এস। নবাবের বেগম্ ক'রে দেব।"

যুবতীদ্বয় ঘাটের দিকে আরও একটু সরিয়া গেল। অবগুণ্ঠন আরও একটু বাড়াইয়া দিল। কিন্তু সৈনিক-পুরুষদ্বয় নিবৃত্ত হইল না। যুবতীদ্বয় যতই পশ্চাতে হঠিতে লাগিল, তাহারাও ততই অগ্রসর হইয়া যুবতীদ্বয়কে ধরিবার চেষ্টা পাইল। তাহারা কখনও বা ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল; কখনও বা প্রলোভনে ভুলাইবার প্রয়াস পাইল। একবার বা বলিল,—"এস—আমাদের সঙ্গে এস; কত আদর পাবে; এমন ক'রে ঘাটে মাঠে ঘুরে বেড়াতে হবে না।" একবার বলিল,—"যদি সহজে না এস, জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে যাব। কেউ আট্‌কাতে পার্‌বে না।"

আলিজান ও মহম্মদীবেগ পরস্পর পরামর্শ করিয়া স্থির করিল,—তাহাদের এক-একজনের ঘোড়ার উপর এক-একটি যুবতীকে উঠাইয়া লইয়া ঘোড়া হাঁকাইয়া দিবে।

আলিজান কহিল,—"ঘোড়ায় পার্‌বে তো?"

মহম্মদীবেগ উত্তর দিল,—"কয় কোশই বা পথ! অনায়াসেই যাওয়া যাবে।"

আলিজান সংশয় প্রশ্ন তুলিল,—"পথে যদি কেউ দেখ্‌তে পায়, বাধা দিতে পারে।"

মহম্মদীবেগ উত্তর দিল,—"সন্ধ্যায় আঁধার একটু পরেই ঘনীভূত হ'য়ে আস্‌বে; পথে লোক-চলাচল বন্ধ হবে। যদি কেউ দেখ্‌তে পায়, বাধা দিতে সাহস ক'র্‌বে না।"

আলিজান। তবে এখানে আর বেশীক্ষণ থাকা উচিৎ নয়। এ ঘাটে সর্ব্বদাই লোকজন জল নিতে আসে। হঠাৎ কেউ যদি এসে পড়ে!

মহম্মদীবেগ। এখন আর এখানে লোকজন আসার সম্ভাবনা নাই। তবে এখানে আর দেরী ক'র্‌তেও আমি ইচ্ছা করি না। এখানকার পথ ঘাট খারাপ, চাঁদের আলো থাক্‌তে থাক্‌তে রওনা হওয়াই শ্রেয়ঃ। আবশ্যক বুঝি, পথে কোথাও অপেক্ষা করা যাবে। এস, ওদের ঘোড়ায় তুলে নিয়ে, তাড়াতাড়ি ঘোড়া হাঁকিয়ে দিই।

এইবার তারা ও শ্যামাকে লক্ষ্য করিয়া আলিজান কহিল,—"তবে কি তোমরা শুন্‌বে না? তবে কি জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে ঘোড়ায় চড়াতে হবে?"

তারা ও শ্যামা দুই জনেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল; দুই জনেই মনে মনে দুর্গা-নাম জপ করিতেছিল; দুইজনেই মনে মনে ভগবানকে ডাকিয়া প্রার্থনা জানাইতেছিল,—"হে কাঙ্গালের হরি, বিপদ-ভঞ্জন, অনাথনাথ! অভাগিনীদের এ বিপদে উদ্ধার কর!"

সহসা আলিজানের কর্কশ-স্বর কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হওয়ায়, তাহারা কাঁপিয়া উঠিল।

কি কুক্ষণেই আজ তাহারা কালাদীঘিতে গা ধুইতে আসিয়াছিল! যদি আসিয়াছিল, তবে কথায় কথায় এত দেরী করিয়া ফেলিল কেন? তাহারা যখন গা ধুইতে আসে, তখন গ্রামের আরও কত মহিলাকে ঘাটে দেখিতে পাইয়াছিল। সকলেই আসিয়া, আপন-আপন কাজ সারিয়া, চলিয়া গিয়াছে; তাহারাই বা পশ্চাতে পড়িয়া রহিল কেন?

অন্য অন্য দিন প্রায়ই তো তাহারা কোনও-না-কোনও বর্ষীয়সীর সঙ্গে আসে, আর তাঁহাদের সঙ্গেই চলিয়া যায়। কিন্তু আজ তাহাদের এ দুর্ম্মতি কেন হইল? যদি আসিয়াছিল, তবে অন্যান্য সকলের সঙ্গে সঙ্গেই বা চলিয়া গেল না কেন? যে সুখ-দুঃখের আলোচনায় এই বিলম্ব ঘটিল, সে আলোচনা বাড়ীতে বসিয়াও তো চলিতে পারিত!

দেশের শোচনীয় অবস্থার বিষয়—দেশব্যাপী অরাজকতার কথা—কাহারও তো এখন অপরিজ্ঞাত নাই! বর্গীর বিভীষিকা—এখনও তো দেশ হইতে একেবারে দূর হয় নাই! 'বর্গী আসিতেছে' শুনিলে এখনও অনেক গ্রামে হাহাকার পড়িয়া যায়,—গ্রামবাসীরা গ্রাম ছাড়িয়া বনে জঙ্গলে পলায়ন করে! এখনও পাঠান-মোগলের ফৌজের অত্যাচার—অনেক স্থলেই পরিদৃশ্যমান! ফৌজ-পল্টন আসিতেছে শুনিলে, এখনও অনেক গ্রামের সুন্দরী রমণীরা পোড়া হাঁড়ীতে মস্তক ঢাকিয়া জলের মধ্যে লুকাইয়া থাকে! ধর্ম্মরক্ষা ও আত্মরক্ষার জন্য, সুন্দরীগণকে এখনও শরীরের ও মুখমণ্ডলের বিকৃতি-সম্পাদন করিতে দেখা যায়।

দেশের এই বিষম সঙ্কট-সমস্যার সময়, তারা আর শ্যামা, কোন্ সাহসে, সন্ধ্যার পরও গ্রাম-প্রান্তস্থিত কালাদীঘিতে অপেক্ষা করিতেছিল?

মহম্মদীবেগ ও আলিজান, কখনও বা মিষ্টবাক্যে কখনও বা ভীতি-প্রদর্শনে, তারা ও শ্যামাকে বুঝাইবার চেষ্টা পাইল। কিন্তু তাহাতে কোনই ফল ফলিল না। তখন তাহারা দুই জনে, হাত বাড়াইয়া, তারা ও শ্যামাকে ধরিতে গেল।

"ছুঁয়ো না!—ছুঁয়ো না!"

তারা ও শ্যামা, দুই জনেই সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল,—"ছুঁয়ো না!—ছুঁয়ো না!"

সৈনিকদ্বয় যতই অগ্রসর হয়, তারা ও শ্যামা, ততই পিছাইয়া যায়।

ইচ্ছা করিলে, সৈনিকদ্বয় জোর করিয়া এতক্ষণ তারা ও শ্যামার অঙ্গস্পর্শ করিতে পারিত। কিন্তু তাহাদের অভিপ্রায়,—কতকটা ভয় দেখাইয়া, কতকটা প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিয়া, সম্মতি-সহকারে, তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইবে। তাহারা বুঝিয়াছিল,—তাহারা যত বড় বলশালী হউক না কেন, জোর-জবরদস্তী করিয়া, দুই জনে দুই জনকে ঘোড়ায় চড়াইয়া লইয়া যাওয়া—বড় সহজ ব্যাপার নহে! যদি তাহারা ঘোড়ার উপর সহজে না উঠে, ঘোড়ায় উঠান' কত কষ্টকর! যদি তাহারা পথে যাইতে যাইতে চীৎকার করে, বিপদের কত সম্ভাবনা! সুতরাং প্রথমে বল-প্রকাশে সৈনিকদ্বয়ের মনে আপনা-আপনিই 'ইতস্ততঃ' হইতেছিল।

কিন্তু যখন তাহারা বুঝিল, সহজে কার্য্য সিদ্ধ হইবে না, তখন অগত্যা বল-প্রকাশে প্রস্তুত হইল।

তৃতীয়ার চাঁদ এখন একটু একটু জ্যোৎস্না ছড়াইতেছিলেন; আর সেই জ্যোৎস্নালোকে সুন্দরীদ্বয়ের মুখ-জ্যোতিঃ বিকশিত হইতেছিল। সুতরাং সৈনিকদ্বয় কোনক্রমেই প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারিল না!

মহম্মদী বেগ, আলিজানকে বলিল,—"দেখ্ আলি। সহজে কিছু হবে না! আয়, আগে স্পর্শ করি, মুখে থুথু দিই, জাত-ধর্ম্ম নষ্ট হ'ক;—তখন আপনি বশ হয়ে আস্‌বে। আমি অমন অনেক দেখেছি; অনেক হিঁদুর মেয়ে ধ'রে নিয়ে এসেছি। তারা প্রথমে কিছুতেই আস্‌তে চায় না। কিন্তু শেষে যখন ধ'রে ফেলি, মুখে থুথু দিই, জাত নষ্ট হ'ল বলি, তখন সুর সুর ক'রে সঙ্গে আসে। হিঁদুর মেয়েদের জব্দ করার এর চেয়ে সহজ উপায় কিছুই নেই। আয়, দু'জনে দু'টোকে আগে ধ'রে ফেলি;—আয়, দু'জনে দু'টোর মুখে আগে থুথু দিই। তা হ'লে ঠিক সোজা হ'য়ে আসবে, সঙ্গে আস্‌তে আর আপত্তি থাক্‌বে না!"

আলিজান। ঠিক ব'লেছিস্ ভাই, ঠিক্ ব'লেছিস্। আয় তবে তাই করি।

এই বলিয়া, দুই জনে দুই জনের প্রতি ধাবমান হইল।

তারা ও শ্যামা প্রথমে মনে করিয়াছিল—মিনতি করিয়া প্রাণভিক্ষা চাহিবে; বলিবে—'তোমরা আমাদের ধর্ম্ম-বাপ, তোমরা আমাদের রক্ষা কর।' কিন্তু যখন তাহাদের শেষ কু-অভিসন্ধির কথা শুনিল; শুনিল—তাহারা জোর করিয়া ধর্ম্ম নষ্ট করিবে বলিয়া কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে; আর বুঝিল—তাহারা কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত হইবে না; তখন দুইজনে কাণে কাণে কি বলাবলি করিল,—দুইজনের হৃদয়ে হৃদয়ে কি-যেন-কি তাড়িৎ-শক্তি সঞ্চারিত হইল,—দুই জনে সমস্বরে শাসাইয়া বলিল,—"খবরদার! আমাদের স্পর্শ করিস্ না।"

শ্যামা সিংহীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিল,—"পাপমতি পিশাচ! আর অগ্রসর হ'স্-নে! তোরা নিশ্চয় জানিস, আমাদের জীবন থাকতে তোরা কিছুতেই আমাদের স্পর্শ ক'র্‌তে পার্‌বি না! তোরা আর একটু অগ্রসর হ'লেই আমরা কালাদীঘির জলে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ ক'র্‌ব!"

আলিজান জিজ্ঞাসা করিল,—"মহম্মদী! এরা বলে কি?"

মহম্মদী উত্তর দিল,—"হিঁদুর মেয়েরা প্রথমে ঐ রকমই আস্ফালন করে বটে! কিন্তু শেষে ধরা পড়্‌লে আপনা-আপনিই পোষ মেনে যায়। আয়, আর দেরি করিস্-নে! এইটেকে আমি ধরি, ঐটেকে তুই ধর।"

এবার উভয়ে যেমন অগ্রসর, অমনি কালাদীঘির জলে ঝম্পপ্রদান-শব্দ উত্থিত হইল।

জল কাঁপিয়া উঠিল। তটভূমি কাঁপিয়া উঠিল। তীরস্থিত তরুরাজি কাঁপিয়া উঠিল। বৃক্ষশাখায় আবদ্ধ ঘোটকদ্বয় কাঁপিয়া উঠিল। চমকে উল্লম্ফনে তাহাদের বন্ধন ছিন্ন হইল। শব্দ শুনিয়া, জলের পানে তাকাইয়া,

ভীতিবিহ্বল হইয়া, অশ্বদ্বয় ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলাইল। বৃক্ষশাখে পক্ষিসকল কলরব করিয়া উঠিল। একসঙ্গে তাহাদের পক্ষ-বিধূনন-শব্দ উত্থিত হইল। সেইশব্দে, আর বাত্যা-বিতাড়িত বৃক্ষপত্রালোড়ন-শব্দে মিলিত হইয়া, প্রান্তর কাঁপাইয়া তুলিল।

আলিজানের ও মহম্মদীবেগের প্রাণও ডুরু-ডুরু কাঁপিয়া উঠিল।

ক্ষণপূর্ব্বে যে প্রকৃতি নিস্তব্ধতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তিনি যেন অকস্মাৎ বিক্ষোভিত হইয়া উঠিলেন। নির্বাত-নিষ্কম্প বৃক্ষবল্লরী বিষম বায়ু-প্রবাহে বিচালিত হইতে লাগিল।

এদিকে, তৃতীয়ার চাঁদ সন্ধ্যাসমাগমে জলের উপর যে একটু কিরণচ্ছটা ছড়াইতেছিলেন;—সেটুকুও সরাইয়া লইলেন।

তখন আর বুদ্‌বুদ পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইল না। কালাদীঘির কাল-জলে আর নৈশ অন্ধকারে এক হইয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—o—

রায়-পরিবার।

"সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখম্।
সুখং দুঃখং মনুষ্যানাং চক্রবৎ পরিবর্ত্ততে॥"

—ব্যাস-বাক্য।

মুর্শিদাবাদ হইতে হাঁটাপথে রাজসাহী পরগণায় যাইতে হইলে, পথের ধারে রূপনগরের রায়েদের বাড়ী দৃষ্টিগোচর হয়। রায়েরা বনিয়াদী-বংশ;

এককালে ঐ অঞ্চলে তাঁহারা সম্পত্তিশালী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। কিন্তু চারি বৎসর পূর্ব্বে বর্গীর হাঙ্গামায় একবার তাঁহাদের ঘর-বাড়ী লুণ্ঠিত হয়। সেই হইতে অবস্থা একেবারে খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। সেই হইতে বাড়ী-ঘরের আর সে শ্রীছাঁদ নাই। সেই হইতে পূজা-পার্ব্বণ বন্ধ হইয়াছে। সেই হইতে সংসারে শোক-তাপ যেন সর্ব্বদাই লাগিয়া রহিয়াছে।

কাশীনাথ রায়,—রায়-পরিবারের যিনি লক্ষ্মীমন্ত পুরুষ ছিলেন,—সেই হাঙ্গামায় আহত হইয়া, ইহলীলা সম্বরণ করেন। হাঙ্গামার পর দুই দিন মাত্র তিনি জীবিত ছিলেন; কিন্তু আহত হওয়ার পরই তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তির ক্ষমতা লোপ পাইয়াছিল। হাঙ্গামায় বাধা দিতে গিয়া, তাঁহার পাঁজরার উপর তরবারির আঘাত লাগে। সেই আঘাতেই তিনি ধরাশায়ী হন। তিনি ধরাশায়ী হওয়ার পর, লুণ্ঠনকারীরা তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লয়। লুণ্ঠনাবশেষে তাহারা ঘরগুলিতে আগুন ধরাইয়া দেয়।

কনিষ্ঠ কৃষ্ণনাথ রায় সেদিন বাড়ী ছিলেন না। পুত্র শিবনাথকে সঙ্গে লইয়া নিমন্ত্রণ উপলক্ষে তিনি নাটোর গিয়াছিলেন। হাঙ্গামার দুই দিন পরে তিনি যখন ফিরিয়া আসিলেন, দেখিলেন—জ্যেষ্ঠ মুমূর্ষু-অবস্থাপন্ন, ঘরগুলি ভস্মসাৎ, পরিবারবর্গ পথে বসিয়া আছে। সে দৃশ্যে কৃষ্ণনাথের মস্তকে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। সে অবস্থায় মানুষ পাগল হইয়া যায়,—মানুষ আত্ম-সংবরণ করিতে পারে না। কিন্তু পুত্র শিবনাথ সেবার তাঁহার ধৈর্য্যাবলম্বনে সহায় হইয়াছিলেন। শিবনাথ পিতাকে বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন,—"বাবা! আপনি অধৈর্য্য হ'লে আমরা দাঁড়াব কোথায়? মা দাঁড়াবেন কোথায়? জ্যেঠাই-মা দাঁড়াবেন কোথায়? শ্যামা দাঁড়াবে কোথায়? খোকা দাঁড়াবে কোথায়? যা গিয়েছে, তা তো আর

ফিরে পাওয়া যাবে না। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে সকলকেই কি যেতে বলেন ?” শিবনাথের সেই প্রবোধ-বাক্যে, পুত্র-পুত্রবধূ-কন্যা প্রভৃতির মুখ চাহিয়া, কৃষ্ণনাথ অনেক কষ্টে সেবার ধৈর্য্যধারণ করিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে ঘরবাড়ীগুলি আবার প্রস্তুত হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে পোড়া-ঘরে চাল উঠাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তবে পোড়া ঘরের চিহ্ন যে একেবারেই লোপ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারা যায় না। কারণ, যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখনও ঠাকুর-দালানের কোঠাটিতে চূণকাম করা—তাঁহার সামর্থ্যে কুলায় নাই। সে কোঠার পোড়া কড়ি, পোড়া বরগা—তখনও অতীত-স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া ছিল।

কিন্তু যাউক সে কথা! সে অতীতের আলোচনায় এখন আর কি ফললাভ সম্ভবপর? পূর্ব্বে যে বাড়ীতে প্রত্যহ দু'বেলা এক শত লোকের পাত পড়িত, সে বাড়ীর পোষ্য-সংখ্যা এখন সবে মাত্র পাঁচটীতে দাঁড়াইয়াছে। সে পুরাতন ইতিহাস এখন উপকথার মধ্যে পরিগণিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং সে পরিচয় পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রদান করিবার প্রয়াস না পাইয়া, এখন যাহা সংসারের অবস্থা, তাহারই একটু আভাস দেওয়ার চেষ্টা পাইতেছি।

বলিয়াছি তো—কৃষ্ণনাথ রায়ের সংসারে এখন স্ত্রী পুরুষে পাঁচটী মাত্র প্রাণী বিদ্যমান। স্বর্গীয় কালীনাথ রায়ের কোনও সন্তান-সন্ততি ছিল না। সুতরাং তাঁহার পত্নী শিবানী দেব্যা এখন কাশীবাসী হইয়াছেন। কৃষ্ণনাথের স্ত্রীর নাম—মহামায়া। তাঁহার সন্তান-সন্ততির মধ্যে দুই পুত্র ও এক কন্যা। কনিষ্ঠ পুত্র রঘুনাথকে মহারাণী ভবানীর নিকট পোষ্য-পুত্র-প্রদানের চেষ্টার বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম শিবনাথ। তাঁহার বিবাহ হইয়াছে। তাঁহার স্ত্রীর নাম—তারাসুন্দরী। কৃষ্ণনাথের কন্যাও বিবাহিতা। তাঁহার নাম—শ্যামাসুন্দরী। দুই জন

মুসলমান-সৈনিকের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য কালাদীঘির জলে সেই যে দুইটী যুবতী ঝম্প প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারাই রায় মহাশয়ের কন্যা ও পুত্রবধূ।

নবম পরিচ্ছেদ।

—o—

"কোথায় গেল!"

"Where art thou, me beloved son,
Where art thou, worst to me than dead?"
—*Wordsworth.*

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল; কন্যা ও পুত্রবধূ বাড়ী ফিরিয়া আসিল না। মহামায়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। পাড়া-প্রতিবাসী যাহারা কালাদীঘিতে গা ধুইতে গিয়াছিল, তাহাদের নিকট সন্ধান লইতে লাগিলেন। সকলেই ঘাট হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে; কিন্তু তাহারা আসিল না কেন?

নিস্তারিণী দেবী সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঘাট হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন,—তিনি তাহাদিগকে ঘাটে দেখেন নাই। কিন্তু কাদম্বিনী বলিতেছেন,—"আমি সন্ধ্যার পর তাহাদিগকে ঘাটে দেখিয়া আসিয়াছি।" দুই জনে দুই রূপ বলিতেছেন! এও এক প্রহেলিকা বটে! এ সংসারে অনেক সময় অনেক ঘটনা এইরূপ প্রহেলিকাময় হইয়া উঠে।

তারা ও শ্যামা তবে কোথায় গেল? ঘাটে গিয়া কোনদিন তাহারা তো এত দেরী করে না!

মহামায়া বাড়ী বাড়ী সন্ধান লইলেন। দেখিলেন,—ঘাট হইতে গ্রামের সকলেই ফিরিয়া আসিয়াছে; কেবল তাহারাই আসে নাই!

তবে কি তাহাদের কোনও অমঙ্গল ঘটিল! তবে কি তাহারা বিপাকে পড়িয়া জলমগ্ন হইল।

কালাদীঘি বিস্তৃত জলাশয়। এ কূল হইতে ও-কূলে দৃষ্টি চলে না। বর্ষাকালে অনেক সময় বন্যার জলে আর কালাদীঘির জলে এক হইয়া যায়। তখন, সময় সময় দীঘিতে হাঙ্গর-কুম্ভীরেরও উপদ্রব হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ঐ দীঘিতে একটা গরুকে হাঙ্গরে ধরিয়াছিল বলিয়া রাষ্ট্র আছে।

দীঘির দক্ষিণ পাড়ে যে একটা প্রকাণ্ড বট-গাছ আছে, সকলের বিশ্বাস, সেই বট-গাছে ভূত বাস করে। তিন দিন হইল, ভূতনাথের মা সেই ভূতের দাঁত কয়েকটা দেখিতে পাইয়াছিল। হরমণির বোন-পো যে সে বৎসর নিরুদ্দেশ হইয়াছে, হরমণি সে সম্বন্ধে অন্য কথা বিশ্বাস করে না। সে বলে—'কালাদীঘির ভূতে তাহার বোন্‌পোকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে।'

কালাদীঘির সম্বন্ধে আরও কত কথাই শুনা যায়।

ঐ অঞ্চলে যত বুড়া-বুড়ী আছে, গোবর্দ্ধনের ঠাকুর মা সকলের অপেক্ষা বয়সে বড়। ঐ অঞ্চলের সকল বুড়া-বুড়ীই সে কথা এক-বাক্যে স্বীকার করে। সেই গোবর্দ্ধনের পিতামহী কালাদীঘির উৎপত্তি সম্বন্ধে সচরাচর যে কথা প্রচার করে, তাহা শুনিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। সে বলে,—সে তাহার ঠাকুরদাদার কাছে গল্প শুনিয়াছে,—ঐ খানে বিক্রমাদিত্য রাজার রাজধানী ছিল। এক দিন সন্ধ্যার পর দারুণ ঝঞ্চা-

বাত উপস্থিত হয়;—সারা-রাত্রি দুর্য্যোগ চলিয়াছিল। প্রাতঃকালে, দুর্য্যোগ থামিলে, রাজধানীতে দরবার করিতে গিয়া, গ্রামস্থ লোকে দেখিল,—সেখানে রাজধানী নাই;—রাজধানীর পরিবর্ত্তে ঐ কালাদীঘির উৎপত্তি হইয়াছে। শুনিল,—ডাকিনীতে রাজধানী অন্য দেশে উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে; রাজধানীর পরিবর্ত্তে কালাদীঘিকে ঐখানে রাখিয়া গিয়াছে।

যে কারণেই হউক, কালাদীঘি সম্বন্ধে লোকের মনে অনেক দিন হইতেই আতঙ্কের সঞ্চার হইয়া আছে।

কন্যা ও পুত্রবধূ এত রাত্রি পর্য্যন্ত প্রত্যাবৃত্ত না হওয়ায়, মহামায়ার হৃদয়ে আতঙ্ক ঘনীভূত হইয়া আসিল। যতই তিনি কন্যা ও পুত্রবধূর ভাবনা ভাবিতে লাগিলেন, কালাদীঘির অতীত-স্মৃতি ততই তাঁহার মন অধিকার করিয়া বসিল। সান্ত্বনা করা দূরে থাকুক, প্রতিবেশিনীগণ অনেকেই তাঁহার আতঙ্ক-বৃদ্ধির পক্ষে সহায়তা করিতে লাগিল। তিনি যে তাহাদের অনুসন্ধানের জন্য দীঘির দিকে কাহাকেও প্রেরণ করিবেন, সে সুবিধাও দেখিতে পাইলেন না।

পুত্র শিবনাথ গৃহে নাই। জামাতার দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের সংবাদ পাইয়া, জামাতাকে আনিবার জন্য, তিনি জামাতৃভবনে গমন করিয়াছেন। পতি কৃষ্ণনাথ, নিমন্ত্রিত হইয়া, কনিষ্ঠ পুত্র রঘুনাথকে সঙ্গে লইয়া নাটোর-রাজধানীতে রওনা হইয়াছেন। সেখানে মহারাণী ভবানী পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবেন। যদি রঘুনাথকে মহারাণীর পছন্দ হয়!—অনেকটা সেই উদ্দেশ্যেই কৃষ্ণনাথ নাটোর গিয়াছেন। সুতরাং তারার ও শ্যামার কে আর সন্ধান লইবে?

হরি সর্দ্দারকে ডাকিয়া, মহামায়া অনেক করিয়া অনুরোধ করিলেন। তাহার সঙ্গে পর্য্যন্ত গমন করিয়া কন্যা ও পুত্রবধূর সন্ধান করিতে প্রস্তুত হইলেন।

হরি সর্দ্দার নিমরাজী হইয়াছিল। পাঁচু ঘোষকে সঙ্গে লইবার চেষ্টা করিতেছিল। ইতিমধ্যে জামাতৃ-সমভিব্যাহারে পুত্র শিবনাথ প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

অনেক দিন পরে জামাতা আসিয়াছেন। তাঁহার দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহের সংবাদ শুনিয়া, মহামায়া যখন দারুণ দুশ্চিন্তায় বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন; সেই অবস্থায় জামাতাকে লইয়া শিবনাথ গৃহে ফিরিয়াছেন। অন্য সময় হইলে, সে আনন্দের অবধি ছিল কি? কিন্তু আজ হরষে বিষাদ উপস্থিত!

মহামায়ার জামাতা ও পুত্র গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছেন বটে; কিন্তু তাঁহার কন্যা ও পুত্রবধূ আজ কোথায়? যে কন্যার ভাবনায় মহামায়া আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; জামাতার দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের সংবাদে যে শ্যামার ভাবী অমঙ্গলাশঙ্কায় তাঁহার হৃদয় মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিল;—আজ তাঁহার সে শ্যামা কোথায়? তাঁহার পুত্র ফিরিয়া আসিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার প্রফুল্ল-কমল পুত্রবধূই বা কোথায় গেল!

জামাতৃ-সহ পুত্র শিবনাথকে সম্মুখে দেখিয়া, মহামায়ার শোকাবেগ যেন উথলিয়া উঠিল। মহামায়া ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। মহামায়ার ক্রন্দনে সকল দুঃসংবাদ জানাইয়া দিল।

শিবনাথ একে একে সকল কথা জানিতে পারিলেন। জামাতা শম্ভুনাথেরও কিছুই জানিতে বাকী রহিল না।

অবিলম্বে অনুসন্ধানের আয়োজন আরম্ভ হইল। শিবনাথ এবং শম্ভুনাথ উভয়ে লোকজন সঙ্গে লইয়া কালাদীঘির দিকে রওনা হইলেন। তারার ও শ্যামার অনুসন্ধানের ব্যবস্থা হইল।

শিবনাথ ও শম্ভুনাথের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামস্থ প্রায় সকলেই কালাদীঘির দিকে গমন করিল। কাহারও হাতে মশাল, কাহারও হাতে লাঠি,

কাহারও হাতে সড়্কি; কেহ বা জাল লইল কেহ বা ভেলার সন্ধান করিতে লাগিল। যাহারা অন্য কিছু না পাইল, তাহারা গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

উদ্যোগ-আয়োজনে রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া গেল। কতকটা যোগাড়-যন্ত্র করিতে বিলম্ব হইল; কতকটা বা, কালাদীঘির পাড়ে রাত্রিকালে যাওয়া অবৈধ—কাহারও মনে এবম্বিধ ধারণার উদয় হওয়ায়, তাহাদের গড়িমশিতে, সেখানে পৌঁছিতে বিলম্ব ঘটিল। এইরূপে সকলে গিয়া কালাদীঘির তীরে যখন উপনীত হইলেন, তখন প্রভাত হইতে অতি অল্পক্ষণ বাকী ছিল।

অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। প্রভাত হইল। দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল। সন্ধ্যা আসিয়া দেখা দিল। কিন্তু কৈ—তাহারা কোথায়? তারা ও শ্যামার কোনও সন্ধানই তো পাওয়া গেল না।

যাহারা বলিল,—"ডুবিয়াছে; চব্বিশ ঘণ্টার পর ভাসিয়া উঠিবে," তাহারাও ক্রমশঃ হতাশ হইল। যাহারা ভূতের আশঙ্কা করিত, তাহারা মনে করিয়াছিল,—ভূতে তাহাদিগকে গাছের উপর তুলিয়া লইয়াছে। কিন্তু গাছের পানে তাকাইয়া সে চিহ্ন কেহই কিছু দেখিতে পাইল না।

মহামায়ার ক্রন্দনে গগন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল—"হায়! তাহারা কোথায় গেল?" শিবনাথ ও শম্ভুনাথের প্রাণের ভিতরও সেই প্রতিধ্বনি উত্থিত হইল—"হায়! তাহারা কোথায় গেল?"

দশম পরিচ্ছেদ।

দৈব-দুর্ব্বিপাক।

"Misfortune never comes alone."

—*Proverb.*

কে বলে—হাসির পর কান্না, কান্নার পর হাসি—সুখ-দুঃখ চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হইতেছে? যদি তাহাই হইবে, তবে কোনও কোনও সংসার কেবলই সুখের উল্লাসে উল্লসিত থাকিবে কেন? —আর, কোনও সংসারে কেবলই মর্ম্মভেদী ক্রন্দনের রোল শুনিব কেন? যদি তাহাই হইবে, কাহারও জন্য সুখের উপর সুখের স্তূপ সজ্জিত থাকিবে কেন? —আর, কাহারও পৃষ্ঠে কষাঘাতের উপর কষাঘাত পড়িবে কেন?

কৃষ্ণনাথ রায় বড় আশায় নাটোর গিয়াছিলেন। মনে করিয়াছিলেন, —পুত্র রঘুনাথকে দত্তক প্রদান করিয়া সংসারের সকল দৈন্য-দারিদ্র্য দূর করিবেন,—আবার রায়-বংশের পূর্ব্বগৌরব প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু বিধাতার কি বিষম চক্র! তাঁহার রঘুনাথ অনিন্দ্য-রূপ-সম্পন্ন হইয়াও মহারাণীর মন আকর্ষণ করিতে পারিল না! তিনি মনে মনে যে সুখের স্বপ্নে বিভোর হইয়াছিলেন, হরিদেব রায়ের পুত্র দত্তক মনোনীত হওয়ায়, তাঁহার সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল।

বিষণ্ণ-মনে নাটোর পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণনাথ যেদিন রূপনগরে যাত্রা করিলেন, সেই দিন পথিমধ্যে হঠাৎ রঘুনাথ পীড়িত হইয়া পড়িল।

নাটোর হইতে রূপনগর দুই দিনের পথ। তাঁহারা রাত্রি থাকিতে রওনা হইয়াছিলেন; সুতরাং একপ্রহরের মধ্যেই পদ্মার পরপারে উপনীত হইলেন।

বৈশাখ মাস। প্রচণ্ড রৌদ্র। সম্মুখে বিস্তৃত প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে। নিকটে গ্রাম-পল্লীর চিহ্ন পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় না। ক্ষণে ক্ষণে ঘূর্ণি-বায়ু-মুখে পদ্মার বালুকা-রাশি উড্ডীন হইতেছে। এক-একবার বায়ুপ্রবাহে আগুনের ঝলক বহিয়া যাইতেছে। সে রৌদ্রে পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ সকলেই ছায়ার আশ্রয় লইবার জন্য উন্মুখ হইয়াছে। ক্বচিৎ কোথাও দুই একটী কৃষক লাঙ্গল স্কন্ধে লইয়া গৃহ-প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে। ক্বচিৎ কোথাও দুই এক টুকুরা খণ্ড-মেঘ আকাশের ক্রোড়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ক্বচিৎ কোথাও দুই একটী বিহঙ্গম গগণ-প্রান্তে উড়িয়া যাইতেছে।

গ্রীষ্মে সকলেই গলদ্‌ঘর্ম্ম। গ্রীষ্মে সকলেই শীতলতা-লাভ-প্রয়াসী। এই দারুণ গ্রীষ্মের দিনে, হঠাৎ কেন রঘুনাথ শীতে কাঁপিয়া উঠিল?

পিতা-পুত্র উভয়ে গো-যানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। প্রান্তরস্থিত বটবৃক্ষ-মূলে গো-যান রক্ষা করিয়া, গরু দুটিকে খুলিয়া লইয়া শকটবান্ তাহাদিগকে জলপান করাইতেছিল। এদিকে ভৃত্য রামদাস, আহারাদির আয়োজনে ব্যাপৃত ছিল। বৃক্ষ-মূলে রৌদ্র কাটাইয়া, বিশ্রামান্তে, অপরাহ্নে, তাঁহারা রূপনগরাভিমুখে রওনা হইবেন,—এইরূপ স্থির হইয়াছিল। এমন সময় সহসা রঘুনাথ শীতে কাঁপিয়া উঠায়, কৃষ্ণনাথের প্রাণটা যেন কেমন করিয়া উঠিল। আহারের আয়োজন করিতে নিষেধ করিয়া, রঘুনাথের নিকটে আসিবার জন্য তিনি রামদাসকে আহ্বান করিলেন। রামদাস নিকটে আসিয়া, রঘুনাথের গায়ে হাত দিয়া দেখিল,—রঘুনাথের গা দিয়া যেন আগুন বাহির হইতেছে। সে মনে মনে

বড়ই ভয় পাইল। কিন্তু প্রকাশ্যে বলিল,—"তেমন কিছুই নয়। গা'টা একটু গরম হয়েছে—দেখ্‌ছি। তা এর জন্য কোনও ভাবনা নেই। ভোর রাত্রে একটু ঠাণ্ডা লেগেছিল, তার পরই রোদ্দুর; এতে জোয়ান মানুষই কাবু হয়;—তা দুধের বালকের সহ্য হবে কেন?"

রামদাস প্রবোধ দিল বটে; কিন্তু কৃষ্ণনাথের মন তাহাতে আশ্বস্ত হইল না। রামদাসকে এবং গাড়োয়ানকে আহারাদি করিতে বলিয়া, তিনি রঘুনাথের পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন। রামদাস তাঁহাকে একটু জল-যোগের জন্য অনুরোধ করিল; কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন না।

মার্ত্তণ্ডদেব যেন সারা দিন অগ্নি-বর্ষণ করিলেন। বট-বৃক্ষের ছায়া-তলে অবস্থান করিয়াও, সেই প্রখর কিরণে সকলেরই দেহ ঝলসিয়া যাইতে লাগিল। একে জ্বরের যাতনা, তাহার উপর রৌদ্রের উত্তাপ!—রঘুনাথ সারাদিন ছট্‌ফট্‌ করিয়া কাটাইল।

দৈনন্দিন কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া, ক্রমে মার্ত্তণ্ডদেব পশ্চিমগগনে আশ্রয় লইতে চলিলেন। রৌদ্রের তেজ মন্দীভূত হইয়া আসিল। পুত্রকে ক্রোড়ের মধ্যে শয়ান করাইয়া লইয়া, কৃষ্ণনাথ রায় শকটবানকে শকট-চালনার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। গো-যান রূপনগরাভিমুখে অগ্রসর হইল।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া, আকাশের পানে দৃষ্টিপাত করিয়া, রামদাস কহিল,—"দাদাঠাকুর! দেবতার অবস্থাটা যেন কেমন কেমন বোধ হ'চ্ছে। নিকটে গ্রাম-পল্লী নেই; মাঠের মাঝখানে হয় তো বৃষ্টি হ'তে পারে!"

রামদাসের কথায় গাড়োয়ান আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিয়া, সে-ও বলিল,—"হাঁ কর্ত্তা ম'শায়! আমারও তাই মনে হ'চ্ছে

বটে। এই মাঠের মাঝে এখন যদি ঝড়-বৃষ্টি আসে, বড়ই বিপদে প'ড়্‌তে হ'বে।"

এইবার কৃষ্ণনাথ রায় একবার আকাশের পানে দৃষ্টিপাত করিলেন। কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি দেখিলেন,—পশ্চিমাকাশে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি একটী সুদীর্ঘ রজত-রেখার সম্পাত হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে মেঘের লক্ষণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। সুতরাং তিনি কহিলেন,—মেঘ কোথায় যে, তোমরা বৃষ্টির আশঙ্কা করিতেছ? গাড়ী চালাইয়া যাও। রাত্রি এক প্রহরের মধ্যেই আমরা এ মাঠ পার হইতে পারিব।"

রামদাস ও গাড়োয়ান আর প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না। পুত্রের পীড়ায়—বাড়ী যাওয়ার জন্য কৃষ্ণনাথের আকুল আগ্রহ। তাহারা প্রতিবাদ করিলে, সে সময় তিনি সে প্রতিবাদে কর্ণপাত করিবেন কেন? আর প্রতিবাদ শুনিলেই বা সে মাঠে তখন আশ্রয় কোথায়—উপায় কি? কৃষ্ণনাথ ভাবিতেছেন,—'কোনও প্রকারে এখন পুত্রকে বাড়ী লইয়া যাইতে পারিলেই মঙ্গল।' তাই তিনি জোরে গাড়ী হাঁকাইবার জন্য পুনঃপুনঃ জিদ করিতে লাগিলেন; বলিলেন,—"যদি বৃষ্টিও আসে, তার মধ্যে আমরা মাঠ পার হ'তে পার্‌ব! তোমাদের কোনও ভাবনা নেই; তোমরা জোরে গাড়ী হাঁকিয়ে যাও!"

সে সময়ে আকাশের অবস্থা দেখিলে, বৃষ্টি হইবে কি না—বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন অপরের তাহা উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য ছিল না। তখনও মেঘের চিহ্ন মাত্র নাই; তখনও সূর্য্যরশ্মি অগ্নিবর্ষণ করিতেছিল; তখনও বায়ু-প্রবাহে তীক্ষ্ণ উষ্ণতা অনুভূত হইতেছিল। সুতরাং বৃষ্টির আশঙ্কা কি প্রকারে সম্ভবপর?

কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই আকাশের কি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন! পশ্চিম-

গগনের সেই রজত-রেখাঙ্কিত অংশ ক্রমশঃ গাঢ়, গাঢ়তর, গাঢ়তম কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল। দেখিতে দেখিতে—ক্রমশঃ বিদ্যুৎ-প্রভা প্রকাশ পাইতে লাগিল।

রামদাস আবার কহিল,—"মেঘ উঠ্‌ছে; ঝড়-বৃষ্টি হওয়ার খুব সম্ভাবনা। এখনও কোথাও আশ্রয় নিতে পার্‌লে ভাল হ'ত।"

কৃষ্ণনাথ রায় আর একবার আকাশের পানে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন,—পশ্চিমাকাশে কাক-ডিম্ব-সদৃশ ঘনকৃষ্ণ মেঘান্তরালে ঘনঘন বিদ্যুৎ-স্ফুরণ হইতেছে। দেখিলেন,—সেই বিদ্যুচ্ছটার বিকাশে কখনও পূর্ব্ব-পশ্চিমে কখনও বা উত্তর-দক্ষিণে দিঙ্মণ্ডল আলোকিত হইয়া উঠিতেছে। কৃষ্ণনাথ রায়ের মনে হইল,—যেন সেই অন্ধকার মেঘের মধ্যে দিগন্তগ্রাসী অনলরাশি ক্ষণে ক্ষণে জ্বলিয়া উঠিতেছে।

রামদাস কহিল,—"এখনই ঝড় উঠ্‌বে।"

গাড়োয়ান গাড়ী সামলাইবার জন্য ব্যস্ত হইল।

কৃষ্ণনাথ রায় অদূরস্থিত একটী বৃক্ষের প্রতি অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক কহিলেন,—"এখন ঐ গাছতলায় নিয়ে গিয়ে গাড়ীখানাকে রাখ্‌লে হয় না!"

গাড়োয়ান গাড়ীর মুখ ফিরাইয়া লইল।

রামদাস বলিল,—"অতদূর যা'বার দেরী সইবে না। ঐ ঝড় উঠ্‌ল।"

প্রকৃতি নির্ব্বাত নিষ্কম্প নিস্তব্ধ ছিল। দেখিতে দেখিতে প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে দিঙ্মণ্ডল কাঁপিয়া উঠিল। আকাশ কাঁপাইয়া, পৃথিবী কাঁপাইয়া, তরু-গুল্ম-লতা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া, ধূলি-পত্র উড়াইয়া, প্রবল-বেগে ঝটিকা প্রবাহিত হইল। মেঘের উপর মেঘ আসিয়া আকাশ ছাইয়া ফেলিল। বায়ু-প্রবাহে শন্‌শন্‌-শব্দে পৃথিবী পরিপূর্ণ হইল। ঘনঘন

বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল। মুহুর্মুহু গম্ভীর-নাদে মেঘ-গর্জ্জন আরম্ভ হইল।

ক্রমে মুষলধারে বৃষ্টি-পতন! মধ্যে মধ্যে অশনি-সম্পাত! মধ্যে মধ্যে করকা-বর্ষণ!

সে অবস্থায় সেই প্রান্তর-মধ্যে পড়িয়া, কৃষ্ণনাথ রায় কি যন্ত্রণা-ভোগ করিলেন, তাহা বর্ণনাতীত। তাঁহাদের গো-যানের আচ্ছাদন উড়িয়া গেল। তাঁহারা সকলেই অবিশ্রান্ত বারি-বর্ষণে অভিষিক্ত হইলেন। কৃষ্ণনাথ রায় আপনার পীড়িত পুত্র রঘুনাথকে যথাসাধ্য সাবধানতার সহিত ক্রোড়ের মধ্যে বস্ত্রাচ্ছাদনে ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু তাহাতেও তাহার শরীরে বারিপতন নিবারণ হইল না। সঙ্গে বস্ত্রাদি জিনিস-পত্র যাহা কিছু ছিল, সকলই ভিজিয়া গেল। পিতা-পুত্র উভয়েই সমভাবে বৃষ্টির জলে পরিস্নাত হইলেন।

প্রায় এক ঘণ্টা কাল মূষলধারে বারি-বর্ষণ হইল। তাহার পর বহুক্ষণ পর্য্যন্ত টিপিটিপি বৃষ্টি পড়িতে লাগিল।

রাত্রি এক প্রহরের পর বৃষ্টি থামিয়া যায়;—ক্রমশঃ মেঘ অপসৃত হয়। তখন, নব-পরিণীতা বধূর অবগুণ্ঠনোন্মচনে মুখচ্ছবি-বিকাশবৎ ঘনান্তরাল-মাঝে দুই একটী নক্ষত্র কুসুম প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। তখন, বৃক্ষ-লতিকা-গাত্রে কোথাও কোথাও দুই চারিটী খদ্যোৎ ঝিকিমিকি জ্বলিতে থাকে। তখন, কোথাও কোনও বৃক্ষান্তরালে বিহঙ্গমের পক্ষ-বিধূনন-শব্দ শ্রুতিগোচর হইতে থাকে।

বৃষ্টি থামিলে, গাত্রবস্ত্র নিঙ্‌ড়াইয়া লইয়া, কৃষ্ণনাথ রায় পুত্রের হস্ত-পদ-গাত্র মুছাইয়া দিলেন। গাড়োয়ান পুনরায় গাড়ী চালাইতে প্রবৃত্ত হইল। রামদাস উৎসাহ দিয়া বলিল,—"ঐ সম্মুখে মাধবপুর গ্রাম দেখা যাচ্ছে; মাধবপুরে পৌঁছিয়াই চৌধুরী ম'শায়দের বাড়ী থেকে কাপড়

চেয়ে এনে রঘুনাথকে সুস্থ ক'র্‌ব। এ পথটুকু একটু কষ্ট ক'রে যেতে পার্‌লেই হয়।"

উপায় তো আর নাই। কৃষ্ণনাথ রায় একইভাবে পুত্রকে বক্ষের উপর ধারণ করিয়া গাড়ীর উপর বসিয়া রহিলেন। গাড়ী আবার পশ্চিমাভিমুখে রওনা হইল।

যে গ্রামখানি লক্ষ্য করিয়া গো-যান চলিতে লাগিল, রামদাস ভুল বুঝিয়াছিল, সে গ্রাম মাধবপুর নয়। অন্ধকারের ঘন-ঘোরে গাড়ীর বয়েল, একটী তেমাথা পথে পথভ্রষ্ট হইয়াছে। এক পথে যাইতে গাড়ী এখন তাই অন্য পথে আসিয়া পড়িয়াছে। এখন তাহারা যে গ্রামে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, সে গ্রামে চৌধুরী মহাশয়দিগের বাস নয়,—সে গ্রামে ফতু ডাকাইত বাস করে। যে পথে যাইতেছে বলিয়া রামদাস মনে করিয়াছিল, এখন বুঝিল—রাত্রির অন্ধকারে তাহার বিপরীত পথে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

গ্রামের মধ্যে গাড়ীখানি প্রবেশ করিবা-মাত্র গাড়ীর শব্দ শুনিয়া ফতু ডাকাইতের একজন অনুচর আসিয়া গাড়ী আটক করিল; বলিল,—"শালা লোক, কাঁহা যাতা হ্যায়?"

উত্তর দিবার পূর্ব্বেই পিলপিল করিয়া পঞ্চাশ ষাট জন ডাকাইত আসিয়া গাড়ী ঘেরিয়া দাঁড়াইল।

কৃষ্ণনাথ রায় সকলই বুঝিতে পারিলেন। তাঁহারা যে পথভ্রষ্ট হইয়া বিপথে আসিয়াছেন, এখন আর তাহা বুঝিতে একটুও বাকী রহিল না।

যাহা হউক, সেই প্রবল দস্যুদলকে বাধা দেওয়া—তাঁহাদের সাধ্যের অতীত। সুতরাং কৃষ্ণনাথ রায় বিনয়-সহকারে দস্যুদলপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"আমার যা কিছু আছে, সব তোমাদের। আমাদের প্রাণে মের না।"

রামদাস একটু রোখ্ দেখাইবার চেষ্টা পাইয়াছিল। কিন্তু কৃষ্ণনাথ রায় তাহাকে শান্ত করিবার উদ্দেশ্যে কহিলেন,—"রামদাস! এ কি ক্রোধ-প্রকাশের সময়? আমাদের কি বিপদ উপস্থিত, কিছুই বুঝিতেছ না কি?"

রামদাস এক পার্শ্বে অবনত-মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল। তথাপি দস্যুদল তাহার প্রতি লাঠি চালাইতে ত্রুটি করিল না। সে আর গাড়োয়ান, দুই জনে প্রথমে দুই-একটী রূঢ় কথা বলিয়াছিল বলিয়া, উভয়েই দস্যুহস্তে উত্তম-মধ্যম প্রহার খাইল। পরিশেষে ডাকাইতেরা সর্ব্বস্ব লুটিয়া লইয়া প্রস্থান করিল। কৃষ্ণনাথ রায় নাটোরে গিয়া যাহা কিছু দান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, দস্যু কর্ত্তৃক সকলই লুণ্ঠিত হইল। রামদাসের ও গাড়োয়ানের তৈজসাদি যাহা কিছু ছিল, দস্যুদল তাহাও লুটিয়া লইয়া গেল।

দস্যুদল চলিয়া গেলে, আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, গাড়ী ফিরাইয়া লইয়া, তাঁহারা অন্যপথে যাত্রা করিলেন। তখন; মেঘাপসরণে আকাশে জ্যোৎস্নার উদয় হইয়াছিল; সুতরাং গন্তব্য পথ চিনিয়া লইতে কোনই সংশয় ঘটিল না।

সারা রাত্রি চলিয়া চলিয়া, গাড়ীখানি প্রভাতে রূপনগরে বাড়ীর নিকট উপস্থিত হইল। রঘুনাথ সারা রাত্রি কৃষ্ণনাথের ক্রোড়ের মধ্যে শুইয়া ছিল; আর কেবলই জননীর নিকট যাইবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছিল। এখন, বাড়ী পৌঁছিয়া, ক্রোড় হইতে তাহাকে নামাইতে গিয়া, কৃষ্ণনাথ দেখিলেন,—রঘুনাথ অচৈতন্য।

কৃষ্ণনাথ ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁহার ক্রন্দনধ্বনিতে বাড়ী কাঁপিয়া উঠিল। মহামায়াও কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিয়া আসিলেন। রঘুনাথের পীড়ার সংবাদ মহামায়া পূর্ব্বে কিছুই অবগত ছিলেন না। সুতরাং

তিনি মনে করিয়াছিলেন, তারার ও শ্যামার নিরুদ্দেশ-সংবাদ শুনিয়াই বুঝি বা তাঁহার পতির শোকাবেগ উছলিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু নিকটে আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে সে ভ্রম বিদূরিত হইল ;—তাহাতে হৃদয়ে আবার এক নূতন শেল বিদ্ধ হইল।

নিকটে অগ্রসর হইয়া, মহামায়া বুঝিলেন,—সর্ব্বনাশ হইয়াছে! দেখিলেন,—রঘুনাথ অচৈতন্য; আর তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া স্বামী আর্ত্তনাদ করিতেছেন। সে দৃশ্য দেখিয়া, মহামায়ার হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন হইল। "রঘুনাথ—রঘুনাথ!" বলিতে বলিতে মহামায়া শিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন।

এই সময় পিতা মাতা উভয়েরই মনে, দারুণ অনুতাপ উপস্থিত হইল ; রঘুনাথকে নাটোরে পাঠাইবার জন্য তাঁহারা যে জিদ্ করিয়াছিলেন, সেই কথাই কেবল মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। তাহাতে, অনুশোচনার তীব্র-তাপে, প্রাণ অস্থির করিয়া তুলিল।

জননী চীৎকার করিয়া কহিলেন,—"বাবা!—বাবা! আমিই তোমার কালস্বরূপিণী! ঐশ্বর্য্যের লোভে আমিই তোমায় বিদায় দিয়াছিলাম!" পিতাও আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন,—"আমার কেন সে দুর্ম্মতি হইয়াছিল? আমি কেন তোমায় নাটোরে লইয়া গিয়াছিলাম!"

পিতা-মাতা দুই জনকেই আত্মহারা দেখিয়া, রামদাস বলিল,—"আপনারা এ কি ক'র্‌ছেন? এখনও রঘুনাথ জীবিত। আপনারা যদি এমন করেন, সে যে আতঙ্কেই মারা যাবে! ব্যারাম এমন কঠিন নয় যে, শুশ্রূষায় সার্‌তে পারে না। আপনারা অধৈর্য্য হ'লে, কে তার শুশ্রূষা ক'র্‌বে? আসুন, রঘুনাথকে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে যাই; চিকিৎসার ব্যবস্থা করি; এখনই সেরে উঠ্‌বে! সারা রাত যে কষ্ট গিয়েছে, তাতে শিশুর প্রাণ কতক্ষণ সবল থাক্‌তে পারে?"

রঘুনাথের অবস্থা দেখিয়া, রামদাসেরও হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল। কিন্তু সে ভাব চাপিয়া রাখিয়া, রামদাস তাঁহাদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিল।

রামদাসের উৎসাহ-বাক্যে পিতা-মাতা উভয়েই কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য-ধারণ করিলেন। বুঝিলেন,—'যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।' সুতরাং জননী বক্ষে ধারণ করিয়া, রঘুনাথকে বাটীর মধ্যে লইয়া গেলেন। বিধিমতে রঘুনাথের মূর্চ্ছাভঙ্গের ও শুশ্রূষার চেষ্টা চলিতে লাগিল।

বাড়ী পৌছিয়া এতক্ষণ পর্য্যন্ত তারার ও শ্যামার সংবাদ কৃষ্ণনাথ কিছুই জানিতে পারেন নাই। এখন যখন তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবনাথের সন্ধান লইতে গেলেন, তখন আর কিছুই অপ্রকাশ রহিল না। দুর্ঘটনার বিষয় সকলই শুনিলেন। শুনিলেন,—পুত্র শিবনাথ ও জামাতা শম্ভুনাথ তাঁহার কন্যা ও পুত্রবধূর সন্ধানে গিয়াছেন। এক দিকে পুত্র মুমূর্ষু-শয্যায়, অন্য দিকে কন্যা ও পুত্রবধূর নিরুদ্দেশে প্রাণ-মান-জাতি-নাশের আশঙ্কা,—কৃষ্ণনাথ রায়ের মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কিন্তু সে চিন্তার—সে ভাবনার তখন আর অবসর হইল না। তখন, রঘুনাথকে লইয়াই তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

একে জ্বরের প্রবল বেগ, তাহার উপর আবার মুষলধারে বৃষ্টি-পতন ; বালকের কোমল শরীরে সহ্য হইবে কেন? অনেক চেষ্টায়, অনেক যত্নে, রঘুনাথের মূর্চ্ছ-ভঙ্গ হইল বটে ; কিন্তু এখন সর্ব্বাঙ্গে বেদনা ; শরীর 'সান্নিপাতিকে' সমাচ্ছন্ন ; গলার ভিতর ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হইতেছে ; বাক্য-রোধ বহু পূর্ব্বেই হইয়াছিল।

জননী 'রঘুনাথ, রঘুনাথ' বলিয়া ডাকিতেছেন। দশ বার ডাকের পর, রঘুনাথ এক একবার মায়ের মুখপানে ছলছল নেত্রে চাহিয়া দেখিতেছে। যেন কত কি বলিবে বলিবে মনে করিতেছে ; কিন্তু বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছে না। তাহার মুখের পানে তাকাইয়া তাকাইয়া

জননীর বক্ষঃস্থল অশ্রুধারায় প্লাবিত হইতেছে। জননী মধ্যে মধ্যে একটু একটু দুধ খাওয়াইবার চেষ্টা পাইতেছেন; কিন্তু সহজে দুধ গলাধঃকরণ হইতেছে না। তবে নিতান্ত যখন মুখ শুকাইয়া আসিতেছে, একটু একটু গরম দুধ আঙ্গুলে করিয়া লইয়া মহামায়া পুত্রের মুখে প্রদান করিতেছেন রঘুনাথ তাহাও গিলিতে পারিতেছে না; দুই দিকের দুই কশ বাহিয়া সে দুধ গড়াইয়া যাইতেছে।

গ্রামে এক ঘর বৈদ্যের বাস ছিল। বৈদ্যের নাম—শ্রীকান্ত কবিরত্ন। তিনি সুচিকিৎসক বটেন; কিন্তু তিনি প্রায়ই সহরে বসবাস করেন। তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ গোবর্দ্ধন আপনা-আপনিই 'কবিচন্দ্রমণি' উপাধি গ্রহণ করিয়া, গ্রামখানিকে এখন আয়ত্তাধীনে রাখিয়াছেন।

রামদাস তাঁহাকে ডাকিতে গেল। রোগীর অবস্থার বিষয় বলিল। কবিচন্দ্রমণি কিন্তু যাত্রার সময় ঠিক করিতে পারিলেন না। অনেকক্ষণ ধরিয়া পুঁথিপত্র নাড়াচাড়া করিয়া, তিনি রামদাসকে বলিয়া দিলেন,—"এ বেলা শুভ মুহূর্ত্ত নাই। জানই তো, আমি লগ্ন না দেখিয়া কখনও কোনও রোগীর চিকিৎসায় ব্রতী হই না। তিন প্রহরের পর, পাঁচ দণ্ডের মধ্যে, শুভ লগ্ন আছে। এখন আমি কোনও কথাই কহিতে পারিব না।"

রামদাস কতই বুঝাইল। একবার তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য, কতই কাকুতি-মিনতি করিল। কিন্তু 'কবিচন্দ্রমণি' কিছুতেই সম্মত হইলেন না। অধিকন্তু, রামদাসকে বিদায় দিয়া, তিনি বলরাম-বাটী গ্রামে চলিয়া গেলেন। সেই গ্রাম হইতে একটী রোগীর চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে ডাকিতে আসিয়াছিল।

রামদাস বিষণ্ণ-মনে ফিরিয়া আসিল। কৃষ্ণনাথ বুঝিলেন,—সকলই

অদৃষ্টের ফের! তিনি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"রামদাস! গোবর্দ্ধনের প্রতি আমার তেমন আস্থাও ছিল না। উহার পিতা কবিরত্ন মহাশয় যদি বাড়ী থাকিতেন, আমি গিয়া, যেমন করিয়া হউক, তাঁহাকে লইয়া আসিতাম। তা' যাক্! তোমরা রঘুনাথকে নিয়ে থাক। আমি এখনই সহরে রওনা হইতেছি। যেমন করিয়া পারি, বৈকালে কবিরত্ন মহাশয়কে লইয়া আসিব।"

কৃষ্ণনাথ রায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সেই দণ্ডে মুর্শিদাবাদ রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। রামদাস বাধা দিয়া বলিতে গেল,—"কাল সারাদিন অনাহারে আছেন; আপনি না গিয়ে, আমি গেলে হ'ত না?"

কৃষ্ণনাথ উত্তর দিলেন,—"না রামদাস! তুমি বোঝ না! আমি না গেলে, তিনিও ওজোর ক'রে না আস্‌তে পারেন!"

রামদাস বলিল,—"যাবেনই যদি, তবে হাতে-মুখে একটু জল দিয়ে যান!"

কৃষ্ণনাথ। হাতে মুখে জল দেবার সময় কি আর আছে, রামদাস! যদি কখনও দিন পাই, আমার রঘুনাথকে বাঁচাতে পারি, আবার হাতে-মুখে জল দেব। নচেৎ, নাওয়া-খাওয়া আমার এই পর্য্যন্ত!"

কৃষ্ণনাথ কাহারও আপত্তি শুনিলেন না,—কোনও বাধাই মানিলেন না। সেই অবস্থায়, সেই ভাবেই তিনি মুর্শিদাবাদে রওনা হইলেন। বৈশাখের প্রচণ্ড রৌদ্র তাঁহার মস্তকের উপর অগ্নি-বর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, তিনি দ্রুতপদে গৃহত্যাগ করিলেন। তবে যাইবার সময় রামদাসকে আর একবার বলিয়া গেলেন,—"রামদাস! তুমি রইলে! আমি যতক্ষণ না ফিরি, তুমি একদণ্ড রঘুনাথের কাছ-ছাড়া হ'য়ো না!"

কৃষ্ণনাথ চলিয়া গেলেন। এদিকে রৌদ্রের উত্তাপ যতই বাড়িতে লাগিল, রঘুনাথের শরীরের উত্তাপও আবার বৃদ্ধি পাইল। রঘুনাথ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—o—

ফুরাইল।

"Like the caged bird escaping suddenly,
The little innocent soul flitted away"

—*Tennyson.*

দিবা তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ-প্রায়। কৃষ্ণনাথ রায় মুর্শিদাবাদে [illegible]ন্ত কবিরাজের বাড়ীতে উপনীত হইলেন। সর্ব্বাঙ্গ ধূলি-ধূসরিত; অ[illegible] স্বেদ-নির্গমে শরীর অভিষিক্ত। হাঁপাইতে হাঁপাইতে তিনি যখন শ্রী[illegible]ন্ত কবিরত্ন মহাশয়ের বৈঠকখানায় উপস্থিত, কবিরাজ মহাশয় তখন আহারান্তে তাকিয়ায় দেহ বিন্যস্ত করিয়া ধূমপান করিতেছিলেন। সেই রৌদ্রে, সেই অবস্থায়, রায় মহাশয়কে সহসা সম্মুখে দেখিয়া, শ্রীকান্ত কবিরত্ন আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; সম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, পদধূলি-গ্রহণপূর্ব্বক কহিলেন,—"রায় মহাশয়! আসুন—আসুন! আপনার শুভাগমন এমন সময় কোথা থেকে হ'ল!

কৃষ্ণনাথ আকুল-চিত্তে কহিলেন,—"বড় বিপদ! আপনাকে এখনই আমার সঙ্গে যেতে হবে।"

কবিরাজ মহাশয় বুঝিলেন,—ব্রাহ্মণের তখনও স্নানাহার হয় নাই। বুঝিলেন,—নিতান্ত বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াই ব্রাহ্মণ অনাহারে বাড়ী হইতে চলিয়া আসিয়াছেন। মনে মনে ভাবিলেন,—কৌশলে স্নানাহার করাইয়া অগ্রে ব্রাহ্মণের শ্রান্তিদূর করা বিধেয়। তাই প্রকাশ্যে কহিলেন,—"তা বেশ—আপনার কোনও চিন্তা নাই—আমি এখনই আপনার সঙ্গে যাচ্ছি। আপনি যত শীঘ্র পারেন, গঙ্গা থেকে স্নান ক'রে আসুন। সামান্য একটু জলযোগের পরই রওনা হওয়া যাবে এখন।"

কৃষ্ণনাথ কহিলেন,—"আমার স্নানাহারের আবশ্যক নাই। আপনি অনুগ্রহ ক'রে এখনই রওনা হ'ন—এই আমার ইচ্ছা। আমার রঘুনাথকে আমি যে অবস্থায় রেখে এসেছি, আমার এক দণ্ড আর বিলম্ব সইছে না।"

কবিরাজ মহাশয় কহিলেন. "আমি বিলম্ব ক'র্‌তে ব'ল্‌ছি না। এখনই আমরা রওনা হ'ব; সেজন্য আপনার কোনও ভাবনা নাই। তবে কি না এত বেলা পর্য্যন্ত আপনি জলগ্রহণ করেন নাই; তাই আপনাকে সামান্য এ[illegible]জল খাইয়ে নিয়ে, এখনি আমি আপনার সঙ্গে রওনা হচ্ছি।"

কৃষ্ণনাথ। আপনি মাপ ক'র্‌বেন—আমি আর স্নানাহার ক'র্‌ব না। য[illegible] আপনার যাওয়া হয়, আমার সঙ্গে এখনি আসুন। আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হ'য়েছে!

রঘুনাথের পীড়ার বিষয় কবিরাজ মহাশয় সকলই বুঝিতে পারিলেন। কৃষ্ণনাথ রায় রোগের অবস্থা কিছু কিছু বিবৃত করিলেন। তাঁহার সঙ্গে-রূপনগরে রওনা হওয়ার বিষয়ে, কবিরাজ মহাশয়ের মনে আদৌ কোনও সংশয়-প্রশ্ন উঠিল না। অধিকন্তু রায় মহাশয়ের কাকুতি-মিনতি দেখিয়া, [illegible]জিত হইয়া, কবিরাজ মহাশয় কহিলেন, "আপনি ও-সব কথা কি

বল্‌ছেন ? আপনাদের খেয়েই আমরা মানুষ। আপনার পিতামহ হরশঙ্কর রায় আমার পিতাকে যে অবস্থায় রূপনগরে এনে বাস করিয়ে-ছিলেন, সে কথা আমি কখনও ভুল্‌তে পার্‌ব না। আমিও তো আপনাদের খেয়েই মানুষ হ'য়েছি। আপনাদের আশীর্ব্বাদে কয় বৎসর হ'ল আমার অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়েছে। তা-না-হ'লে, হয় তো এখনও আমায় আপনাদেরই গলগ্রহ হ'য়ে থাক্‌তে হ'ত! আপনি নিজে এসেছেন, এর উপর আর কি কোনও কথা আছে? যদি পথের লোকের কাছেও আপনার পুত্রের পীড়ার সংবাদ পেতাম, আমি আপনা-আপনিই তদ্দণ্ডে রূপনগরে যাত্রা ক'র্‌তাম। স্নান কর্‌তে বা একটু জল খেয়ে নিতে আপনার যে বেশী দেরী হবে, আপনি তা ভাব্‌বেন না। আমি দু'খানা পাল্কীর বন্দোবস্ত ক'র্‌ছি। দু'জনে সাঁ সাঁ ক'রে গিয়ে পৌঁছাব—এখনি। ঔষধ-পত্র গুছিয়ে নিতেও তো একটু দেরী হবে।"

এই বলিয়া কবিরাজ মহাশয় আপনার গদাই-মাধাই দুই ভৃত্যকে আহ্বান করিলেন। গদাই-মাধাই নিকটে উপস্থিত হইল। রায় মহাশয়কে স্নান করাইয়া আনিবার জন্য তিনি গদাইকে আদেশ করিলেন। মাধাই পাল্কী-বেহারার বন্দোবস্তের জন্য আদিষ্ট হইল।

কৃষ্ণনাথ রায়, কবিরাজ মহাশয়ের কথার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিলেন। কবিরাজ মহাশয়ও ছাড়িবার পাত্র নহেন। সুতরাং অনিচ্ছা সত্ত্বেও রায় মহাশয়কে স্নান করিতে যাইতে হইল। রায় মহাশয় একবার বলিতে গেলেন, "দু'খানা পাল্কীর দরকার নেই—আমি অনায়াসে হেঁটে যেতে পার্‌ব।" কিন্তু কবিরাজ মহাশয় তাহাতে উত্তর দিলেন, "আপনি সে কি কথা বলেন? আপনি হেঁটে যাবেন, আর আমি পাল্কীতে যাব? শ্রীকান্ত কবিরাজ কি এতই মনুষ্যত্ব-হীন?"

কৃষ্ণনাথ রায় সে কথার উত্তর দিতে পারিলেন না। তাঁহার নয়ন-

প্রান্তে জলধারার সঞ্চার হইল। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—"হায়! এই মহানুভবের পুত্রই কি সেই গোবর্দ্ধন! এমন মানুষেরও তেমন পুত্র হয়!"

দণ্ডেকের মধ্যেই সকল বন্দোবস্ত স্থির হইয়া গেল। দণ্ডেকের মধ্যেই কবিরাজ মহাশয় জলযোগের বিপুল আয়োজন করিয়া দিলেন। দণ্ডেকের মধ্যেই কৃষ্ণনাথ রায় গঙ্গাস্নান করিয়া নিত্য-নৈমিত্তিক আহ্নিকাদি সারিয়া আসিলেন।

কবিরাজ মহাশয়ের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে, নিতান্ত অনিচ্ছা-সত্ত্বেও, কৃষ্ণনাথ রায়কে কিছু কিছু ফল-মূল খাইতে হইল। জলযোগের পর, দুই জনে দুই খানি পাল্কীতে চড়িয়া রূপনগর অভিমুখে রওনা হইলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাঁহারা রূপনগরে পৌঁছিতে পারিবেন,—বেহারারাও জোর করিয়া বলিল।

* * * *

ক্রমে বেলা অবসান হইল। সূর্য্যের উত্তাপ কমিয়া আসিল স্নিগ্ধসমীর-সঞ্চারে রঘুনাথের গাত্রের উত্তাপ কমিয়া আসিবে বলিয়া আশার সঞ্চার হইল। এদিকে কৃষ্ণনাথের প্রত্যাবর্ত্তনের সময়ও নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। তাই মহামায়া, এক একবার পথ-পানে চাহিয়া, রামদাসকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—"কৈ রামদাস! তিনি তো কৈ এখনও এলেন না! এখনও কি তাঁর আস্‌বার সময় হয়-নি?"

মহামায়ার ব্যাকুলতা-দর্শনে রামদাস সান্ত্বনা-বাক্যে কহিল,—"এখনই তিনি এলেন ব'লে! দারুণ রোদ্দুর; তাই বোধ হয় আসতে একটু দেরী হ'চ্ছে!"

এই বলিয়া, রঘুনাথের গাত্রে হস্ত প্রদান করিয়া, রামদাস কহিল,—"এই তো গা একটু একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে আস্‌ছে। একটু একটু ঘামও

হ'চ্ছে। এইবার ঘাম দিয়ে জ্বরটা ছেড়ে যাবে আপনি ব্যস্ত হ'বেন না। জ্বরটা ছাড়লেই রঘুনাথ সুস্থ হবে।"

কিন্তু মায়ের প্রাণ—প্রবোধ মানিল না! মহামায়া বলিলেন,—"রামদাস! তুমি একটু এগিয়ে দেখ-না কেন?"

রঘুনাথের গাত্রে হস্ত প্রদান করিয়া, রামদাস মনে মনে বুঝিয়াছিল—তখন আর অন্যত্র গমন কর্ত্তব্য নয়। তাই সে প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করিতেছিল। কিন্তু সে একবার বাহিরে যাইলে, মহামায়ার প্রাণ আশ্বস্ত হয়,—তাই সে বাটীর বাহিরে একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে গেল। বাহিরে গমন করিতেই সহসা আকাশের পানে তাহার দৃষ্টি সঞ্চালিত হইল। রামদাস দেখিল,—ঠিক পূর্ব্ব-দিনের ন্যায় পশ্চিম-গগনে এক খণ্ড মেঘের উদয় হইয়াছে। দেখিয়া বুঝিল,—'গত কল্যকার ন্যায় আজিও ঝড়ঝঞ্ঝা-বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা; একটু পরেই ঝড় উঠিবে, একটু পরেই বৃষ্টি আসিবে।' তাই সে বাড়ীর দিকে আবার ফিরিয়া আসিল। ফিরিয়া আসিয়া, মহামায়াকে আশ্বাস দিয়া কহিল,—"চিন্তার কোনও কারণ নাই। তাঁরা এলেম ব'লে!"

রঘুনাথের গাত্র হইতে এই সময় অবিরাম ঘর্ম্ম-নিঃসরণ হইতেছিল। রামদাস তাই আর এক বার রঘুনাথের গাত্রে হস্ত-প্রদান করিয়া দেখিল। কিন্তু দেখিয়া যাহা বুঝিল, তাহাতে তাহার আশঙ্কা বড়ই বৃদ্ধি পাইল। সে দেখিল,—এক দিকে গা দিয়া গল্‌গল্‌ করিয়া ঘাম বাহির হইতেছে, অন্য দিকে রঘুনাথের হাত-পা শীতল হইয়া আসিতেছে। মহামায়ার নিকট যদিও সে কোনরূপ আশঙ্কার ভাব প্রকাশ করিল না, কিন্তু মনে মনে বড়ই শঙ্কা বোধ করিল। এক বার তাহার মনে হইল,—'রঘুনাথের হাতে-পায়ে সেক দিতে আরম্ভ করি।' পরক্ষণেই আবার মনে হইল,—'পাড়ার কোনও প্রবীণ ব্যক্তিকে ডাকিয়া আনি।' এই মনে করিয়া

রামদাস কহিল,—"আমি আর এক বার এগিয়ে দেখি,—তাঁরা কত দূরে আস্‌ছেন!" মহামায়ারও ইচ্ছা, রামদাস আর একবার পথে গিয়া দেখিয়া আসে—তাঁহারা কত দূরে আসিতেছেন।

এই সময় মেঘ একটু ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছিল। মেঘের অবস্থা দেখিয়া, পাড়ার দুই একটী স্ত্রীলোক—যাহারা রঘুনাথকে দেখিতে আসিয়াছিল—প্রায়ই বাড়ী চলিয়া গিয়াছিল। কেবল নিস্তারের মা, রামদাসের অনুরোধে এতক্ষণ উঠিয়া যাইতে পারে নাই। কিন্তু এইবার, রামদাস বাহিরে যাওয়ায়, সে-ও উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল,—"কেমন মেঘ মেঘ ক'র্‌ছে। ঘুঁটেগুলো বাইরে প'ড়ে আছে; সেগুলোকে সাম্‌লে রেখে, একটু পরে আমি আস্‌ছি।" মহামায়া অনিমেষ-নয়নে একাগ্র-চিত্তে পুত্র রঘুনাথের মুখপানে চাহিয়াছিলেন। নিস্তারের মা, কি বলিল বা না বলিল, সেদিকে তাঁহার মন আকৃষ্ট হইল না। নিস্তারের মা ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

রামদাসও বাহিরে গিয়াছে। নিস্তারের মাও চলিয়া গেল। মহামায়া একইভাবে পুত্রের মুখপানে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন।

সহসা বিষম ঝটিকা উত্থিত হইল। প্রবল বেগে মেঘসমূহ সঞ্চালিত হইতে লাগিল। ঘনঘন বিদ্যুচ্চমকে অশনিসম্পাতে ধরণী কাঁপিয়া উঠিল।

"কড় কড় কড়!"—বিদ্যুচ্চমকের সঙ্গে সঙ্গে কর্ণপটহ বিদীর্ণ করিয়া বজ্রধ্বনি ধ্বনিত হইল। বিদ্যুৎ-শিখায় চক্ষু ঝল্‌সিয়া গেল। বজ্রধ্বনিতে গৃহ কাঁপিয়া উঠিল। শয্যা কাঁপিল। রঘুনাথ কাঁপিল। মহামায়া কাঁপিলেন।

দারুণ ত্রাসে বিকট স্বরে 'মা' বলিয়া রঘুনাথ চীৎকার করিয়া উঠিল।

"ভয় কি—ভয় কি বাবা! এই যে আমি!"—এই বলিয়া মহামায়া রঘুনাথকে বক্ষমধ্যে টানিয়া লইলেন।

কিন্তু হায়! সেই শেষ! সেই 'মা'-বুলিই রঘুনাথের শেষ-বুলি!

'মা' বলিয়াই রঘুনাথ উঠিয়া বসিল। জননী শশব্যস্তে হস্তপ্রসারণ করিলেন। রঘুনাথ ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় জননীর ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িল। আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। আর চক্ষের পলক পড়িল না। নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ-শিখার অন্তিম-দীপ্তির ন্যায়, একবার উঠিয়া—একবার মা বলিয়া ডাকিয়াই, রঘুনাথ চৈতন্যহারা হইল।

ফুরাইল—সকলই ফুরাইল—জনমের মত সব শেষ হইল!

জননী চাহিয়া দেখিলেন,—রঘুনাথের আর সাড়া-শব্দ নাই। দেখিলেন,—চক্ষু কপালে উঠিয়াছে। দেখিলেন,—মুখ বিবর্ণ হইয়াছে। দেখিলেন,—অঙ্গপ্রতঙ্গ শীতল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মার প্রাণ বুঝিল না। মহামায়া 'রঘুনাথ—রঘুনাথ', 'বাবা—বাবা' বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

কোথায় রঘুনাথ?—কে উত্তর দিবে? এ যে কেবল পিঞ্জর পড়িয়া রহিয়াছে! প্রাণপাখী পিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া উড়িয়া পলাইয়াছে!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—o—

অশ্রু-জল।

"There is a tear for all that die.
A mourner over the humblest grave."
—*Byron.*

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মুষল-ধারে বৃষ্টি-পতন হইল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আকাশ ঘন-ঘটাচ্ছন্ন রহিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কেহই ঘরের বাহির হইতে পারিল না।

সেই দুর্য্যোগে, সেই বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে, রামদাস মহেশ-মণ্ডলকে ডাকিয়া আনিল। মহেশ-মণ্ডল হাত দেখিতে জানে,—তাহার নাড়ীজ্ঞান চমৎকার! সেই বিশ্বাস-বশে রামদাস তাহাকে বৃষ্টিতে ভিজাইয়া ভিজাইয়াও লইয়া আসিল। বৃষ্টি বলিয়া মহেশও অবশ্য কোনও আপত্তি করিল না।

কিন্তু ফিরিয়া আসিয়াই রামদাস দেখিল—সর্ব্বনাশ হইয়াছে!—রামদাস যে আশঙ্কা করিয়াছিল, তাহাই ঘটিয়াছ! রামদাস দেখিল,—মৃত-পুত্র ক্রোড়ে লইয়া মহামায়া আকুলি-ব্যাকুলি ক্রন্দন করিতেছেন। সে দৃশ্য দেখিয়া, রামদাসও অশ্রু-সংবরণ করিতে পারিল না। মহামায়া কাঁদিতে লাগিলেন। রামদাস কাঁদিতে লাগিল। মহেশ-মণ্ডলের চক্ষেও অশ্রুধারা বিনির্গত হইল।

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। ক্রন্দনের রোলে গ্রাম প্রতিধ্বনিত হইল। দেখিতে দেখিতে পাড়া-প্রতিবাসী সকলেই আসিয়া কৃষ্ণনাথ রায়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। কেহ বা কন্নায় কান্না মিশাইলেন। কেহ বা মহামায়াকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা পাইলেন। কেহ বা শিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন। কেহ বা কৃষ্ণনাথ রায়ের প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষায় পথপানে চাহিয়া রহিলেন।

ঝড়বৃষ্টি-দুর্য্যোগে কৃষ্ণনাথ রায় যথাসময়ে কবিরাজ মহাশয়কে লইয়া গ্রামে পৌছিতে পারিলেন না। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাঁহাদের গ্রামে পৌছিবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু রাত্রি এক প্রহরের মধ্যেও তাঁহাদের আসা ঘটিয়া উঠিল না। দুর্য্যোগের সময় বাহকগণ পাল্কী বহন করিতে না পারায়, বৃষ্টি না থামা পর্য্যন্ত, তাঁহাদিগকে পথে অবস্থান করিতে হইল। পথে যতই বিলম্ব হইতে লাগিল, কৃষ্ণনাথের প্রাণ ততই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কত দুশ্চিন্তা আসিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। কিন্তু কি

করিবেন?—উপায় নাই!—বিধাতা বাম! তাঁহার দেহ পাল্কীর মধ্যে পড়িয়া রহিল বটে; কিন্তু মন রূপনগরে রঘুনাথের নিকট চলিয়া গেল।

দুর্য্যোগ থামিলে, কবিরাজ মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া, কৃষ্ণনাথ রায় যখন গ্রামে পৌঁছিলেন, দূর হইতে ক্রন্দন-ধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। সেই ক্রন্দন-ধ্বনি কর্ণে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, তাঁহার প্রাণটা কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু তখনও একেবারে হতাশ হইতে পারিলেন না। কখনও মনে হইল,—'উহা ক্রন্দনের স্বর নহে।' কখনও মনে হইল,—'ও স্বর অন্য কোথা হইতে আসিতেছে।'

কবিরাজ-সহ কৃষ্ণনাথ রায় বাড়ী পৌঁছিলেন! কৃষ্ণনাথের প্রাণভরা আশা—শ্রীকান্ত কবিরত্নকে একবার দেখাইতে পারিলেই তাঁহার রঘুনাথ সারিয়া উঠিবে। কিন্তু হায়! এখন কোথায় রঘুনাথ?—কবিরাজ মহাশয় কাহার চিকিৎসা করিবেন? বাড়ীতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে কৃষ্ণনাথের কিছুই আর বুঝিতে বাকী রহিল না। মহামায়ার ক্রন্দনের স্বর কর্ণরন্ধ্রে বজ্রধ্বনিবৎ প্রবিষ্ট হইল। পাড়া-প্রতিবাসীর হাহাকারে প্রাণ বিচলিত করিয়া তুলিল। পাল্কী হইতে নামিয়া, 'রঘুনাথ—রঘুনাথ' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কৃষ্ণনাথ রায় অন্দরে প্রবেশ করিলেন। কবিরাজ মহাশয় বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করার আর আবশ্যকতা বুঝিলেন না। বাহিরে দাঁড়াইয়াই প্রতিবাসীদিগের নিকট দুঃসংবাদের বিষয় সকলই জানিতে পারিলেন।

কৃষ্ণনাথ রায় অন্দরে প্রবেশ করিবা-মাত্র, তাঁহাকে দেখিয়া, মহামায়ার শোকসমুদ্র আরও উথলিয়া উঠিল। মহামায়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিলেন,—"এসেছ! এসেছ! তুচ্ছ ঐশ্বর্য্যের লোভে আমার সোণার মাণিককে বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছ!" কৃষ্ণনাথ রায় কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—"কৈ—কৈ রঘুনাথ!" মহামায়া উন্মাদিনীর ন্যায়

উত্তর দিল,—"এতক্ষণ আস্‌তে পার্‌লে না! রঘুনাথ যে চলে গেল! রঘুনাথ—রঘুনাথ!"

পতি-পত্নী দুইজনে রঘুনাথকে জড়াইয়া ধরিয়া 'রঘুনাথ—রঘুনাথ' বলিয়া, ক্রন্দনে গগন কাঁপাইয়া তুলিলেন। কৃষ্ণনাথ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—"রঘুনাথ! রঘুনাথ! ওঠ বাবা—একবার ওঠ! তোমার জন্য আমি যে মুর্শিদাবাদ থেকে কবিরাজ নিয়ে এসেছি!"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

———o———

ভবানী-পূজা।

বড় আনন্দ উদয়।
শঙ্খ-ঘণ্টা-রব মহা-মহোৎসব,
ত্রিভুবনে জয় জয়॥
—ভারতচন্দ্র।

একদিকে অন্ধকার, অন্যদিকে আলোক-মালা। একদিকে হাহাকার, অন্য দিকে আনন্দের লহরী-লীলা। বিধির কি বিচিত্র বিধান!

একদিকে বিটপীর শুষ্ক-পত্র ঝরিয়া পড়িতেছে, অন্যদিকে বিটপী নবকিশলয়ে পুষ্প-পরাগে প্রফুল্লিত হইতেছে। এক দিকে প্রা[illegible]গ্রীষ্মে নদী [illegible]য়া বালু-কঙ্কর সার হইয়া পড়িতেছে; অন্যদিকে ভাদ্রের ভরা যৌবনে উচ্ছ্বসিত উল্লসিত তরঙ্গ-ভঙ্গে সে অভিনব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছে।

স্বয়ং পুরোহিত-বেশে আবির্ভূত হইয়া লোকসমক্ষে মহামায়ার পূজা-মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছেন।

আরতি শেষ হইল। বাদ্যধ্বনি থামিয়া গেল। সমবেত নরনারী সকলেই সাষ্টাঙ্গে মায়ের উদ্দেশে প্রণাম করিল। অবশেষে আবার সকলে সমস্বরে 'জয় মা ভবানী' রবে পুরী প্রতিধ্বনিত করিয়া মন্দির-প্রাঙ্গণ পরিত্যাগ করিয়া গেল।

মায়ের বাল্য-ভোগ—নিরামিষ; চিড়া, দই, গুড়, মুড়কি, ক্ষীর, সন্দেশ, কলা, পান, শুপারি ইত্যাদি। এই বাল্য-ভোগ দর্শন করিলে মনে হয়—মা যেন পরমা বৈষ্ণবী।

কিন্তু মধ্যাহ্নে এ আবার কি দেখি! মায়ের স্নানের পর যখন মধ্যাহ্ন-পূজা আরম্ভ হইল, তখনও সেই বাদ্য, সেই লোকসমাগম, সেই জন-কোলাহল! অন্যান্য আয়োজন সকলই প্রাতঃকালের ন্যায়; কিন্তু পূজার এ কি বিপরীত আয়োজন! এখন সারি-সারি যূপ-কাষ্ঠ; আর তাহার পার্শ্বে শত শত ছাগ, মেষ, মহিষ—বলির জন্য প্রস্তুত। সেগুলিকে সবে মাত্র স্নান করান হইয়াছে; তাহারা কাঁপিতে কাঁপিতে চীৎকার করিতেছে।

এই মধ্যাহ্ন-পূজার পুরোহিত স্বতন্ত্র, পূজোপকরণ স্বতন্ত্র, ভোগের আয়োজন স্বতন্ত্র। পুরোহিতের পরিধানে রক্তাম্বর, ললাটে রক্ত-চন্দনের ত্রিপুণ্ড্রক, বাহুদ্বয়ে রক্ত-চন্দনের অনুলেপন। সিন্দূর-বিলেপিত উৎসর্গীকৃত খড়্গাসহ মন্দিরের বাহিরে আসিয়া তিনি বলি উৎসর্গ করিলেন। অনন্তর খড়্গ ছেদকের হস্তে অর্পিত হইল।

বলিদানের বাদ্য বাজিয়া উঠিল। আবার ঢক্কা-নিনাদে শঙ্খ-ঘণ্টা-ধ্বনিতে পুরী প্রকম্পিত হইতে লাগিল। বলিদানের ছাগ, মেষ, মহিষ—যথাক্রমে যূপকাষ্ঠে সংবদ্ধ হইল। তাহাদের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে গগন-

বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তখন, সেই মন্ত্রপূতঃ খড়্গ গ্রহণ করিয়া, ছেদক একে একে বলি-কার্য্য সম্পন্ন করিল। বলিদানের রক্তস্রোতে ভবানীর প্রাঙ্গণ প্লাবিত হইল। বলিদানান্তে অনেকে সেই রক্ত মাখিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। মায়ের মধ্যাহ্ন-পূজা সমাপন হইল।

প্রভাতে বাল্য ভোগে যাঁহাকে পরমা বৈষ্ণবী বলিয়া মনে হইতেছিল, মধ্যাহ্নে মায়ের সে ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত। ভাবুক ভক্ত! ভাব দেখি,—মা কোন্ ভাবে কখন অবস্থিতি করেন?

মহামায়ার পূজার সময়, পোষ্য-পুত্রকে পার্শ্বে বসাইয়া মহারাণী ভবানী গললগ্নীকৃতবাসে মার নিকট মঙ্গল-প্রার্থনা করিতেছিলেন। এত গণ্ডগোল, এত বাদ্যধ্বনি, এত কোলাহল,—কিছুই যেন তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল না। তিনি যেন তন্ময় হইয়া মার প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া প্রার্থনা জানাইতেছিলেন,—"মা মঙ্গলময়ি! জগতের মঙ্গল-বিধান কর মা!"

পোষ্য-পুত্র—কুমার রামকৃষ্ণ!—তিনি মাতার পার্শ্বেই বসিয়াছিলেন বটে; মাতার ন্যায় একাগ্রচিত্তে মহামায়ার নিকট প্রার্থনা জানাইতে-ছিলেন বটে; কিন্তু সময়ে সময়ে তাঁহার প্রাণ বিচলিত হইতেছিল। বলিদানের সময় যখন তিনি দেখিলেন,—বলিদানের ছাগাদি পশুগণ প্রাণভেদী আর্ত্তনাদ করিতেছে, আর তাহাদের সেই আর্ত্তনাদে কেহই কর্ণপাত করিতেছে না, পরন্তু মায়ের সম্মুখে তাহাদের মুণ্ডচ্ছেদ হইতেছে; তখন আর তিনি কোনক্রমে স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি আবেগভরে চীৎকার করিয়া মাতা ভবানীকে ডাকিয়া কহিলেন,—"মা! এ কি নৃশংস ব্যাপার! মায়ের পূজায় কেন এত প্রাণীর প্রাণনাশ হয়?"

তন্ময়-চিত্ত ভবানীর কর্ণে কুমারের সেই উচ্চ চীৎকারও বুঝি প্রবেশ করিল না। মহারাণী কোনও উত্তর দিবার পূর্ব্বেই কুমারকে সম্বোধন

করিয়া পুরোহিত কহিলেন,—"কুমার! এ বলিদানের নৃশংসতা কোথায় দেখিলেন? বলিদানে পশুগণের জীবন সার্থক হইল। বলিদানে— বন্ধন-মোচন!"

'বন্ধন-মোচন!'—কুমার শিহরিয়া উঠিলেন। কত অতীতস্মৃতি তাঁহার মানস-পটে জাগিয়া উঠিল। মনে পড়িল, সন্ন্যাসীর কথা! মনে পড়িল—পাখীর বন্ধন-মোচনের কথা! মনে পড়িল—বন্ধন-মোচনে আপনার প্রতিজ্ঞার কথা!

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

সংশয়-প্রশ্ন।

"এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে॥"

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

হরিদেব রায়ের পুত্র গোপাল মহারাণী ভবানীর পোষ্যপুত্র মনোনীত হইয়াছেন। তিনিই এখন—কুমার রামকৃষ্ণ।

নাটোর-যাত্রার সময় হরিদেব রায় শান্তিদেবীর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহার গোপালকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবেন। কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয় নাই। ত্র্যধিক শতসংখ্যক বালকের মধ্যে গোপাল মহারাণীর পোষ্যপুত্র মনোনীত হয়। তখন, অর্থের লোভে, উচ্চ আকাঙ্ক্ষার মোহে, পত্নীর নিকট প্রতিজ্ঞার কথা হরিদেব রায় একেবারে বিস্মৃত হইয়াছেন। গোপালকে দত্তক দিয়া মহারাণীর নিকট আটগ্রাম পুরস্কার পাইয়া, সেই আনন্দেই তিনি গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হন। শান্তিদেবীকে যে কি বলিয়া প্রবোধ দিবেন, সে ভাবনা তখন আদৌ তাঁহার মনে উদয় হয়

না। আজি প্রায় এক মাস অতীত হইল, তিনি গোপালকে নাটোরে রাখিয়া গিয়াছেন। সেই হইতে গোপাল, আর গোপাল নাই; গোপাল —রামকৃষ্ণ-রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

ভবানী-মন্দিরে বলিদান-প্রসঙ্গে পুরোহিতের উত্তর শুনিয়া, কুমার রামকৃষ্ণ কেমন যেন অন্যমনা হইয়াছেন। রাজধানীতে আসিয়া অবধি এ পর্য্যন্ত তিনি আদরের, সোহাগের, আনন্দের নূতন নূতন লহরে ভাসমান হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই দিন হইতে তাহার সকল ভাব পরিবর্ত্তিত হয়। এখন তিনি কেবলই নির্জ্জন স্থান অনুসন্ধান করেন;—নির্জ্জনে বসিয়া নির্জ্জন-চিন্তায় কালাতিপাতে তাঁহার আনন্দ অনুভব হয়।

কুমার কি ভাবেন?—কি চিন্তা করেন? সুখৈশ্বর্য্য-পালিত দশম-বর্ষীয় বালকের চিন্তার কারণ আবার কি থাকিতে পারে?

কুমারের এইরূপ ভাব-বৈলক্ষণ্যের প্রতি অল্প দিনের মধ্যেই মহারাণী ভবানীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। এক দিন নিভৃতে বসিয়া পাগলের ন্যায় কুমার আপন মনে কি বলিতেছেন; কুমারকে তদবস্থ দেখিয়া, অন্তরালে দাঁড়াইয়া, কুমার কি বলে—তাহা শুনিবার জন্য, মহারাণী চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। সুতরাং নিকটস্থ হইয়া স্নেহ-সম্ভাষে কুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি একলা ব'সে ব'সে কি ভাব্‌ছ বাবা? এখানে এসে তোমার কি কোন কষ্ট হ'য়েছে?"

কুমার বিনীত-স্বরে উত্তর দিলেন,—"না—মা! আমার তো কোনও কষ্ট হয়-নি!"

ভবানী। তবে তুমি সর্ব্বদাই অমন ক'রে ব'সে থাক কেন বাবা! তোমার কিসের অভাব আছে যে, তুমি বিষণ্ণ-মনে ব'সে থাক? যদি তোমার কোনও কষ্ট হয়ে থাকে, আমায় স্পষ্ট করে বল—আমি তোমার সে কষ্ট দূর কর্‌বার চেষ্টা ক'র্‌ব।

কুমার। আমার তো কোনও কষ্টই নেই মা !

ভবানী। তবে তুমি কি ভাব ?—কি চিন্তা কর ? আমার মনে হয়, তোমার চিত্ত যেন দারুণ দুশ্চিন্তা-ভারে ভারাক্রান্ত !

কুমার এতদিন ভাবিতেছিলেন—'কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব ? কে আমার প্রশ্নের উত্তর দিবে ? এই সমস্যাই তাঁহার হৃদয়কে দুশ্চিন্তা-ভারে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছিল। সুতরাং মহারাণীর প্রশ্নে কুমারের হৃদয়-ভার কথঞ্চিৎ লাঘব হইল। কহিলেন,—"মা ! আপনি সত্যই বলিয়াছেন। আমার হৃদয় সত্যই দারুণ দুশ্চিন্তা-ভারে ভারাক্রান্ত।"

ভবানী। বাবা, কি সে দুশ্চিন্তা ?

কুমার, জীবনের সেই দুইটী স্মরণীয় ঘটনার কথা উল্লেখ করিলেন। সন্ন্যাসী বলিয়াছিলেন,—'পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গমের মুক্তিদানে তাহার বন্ধন-মোচন হয়।' আবার ভবানী-মন্দিরের রাজপুরোহিত বলিয়াছেন,—'বলিদানে পশুর বন্ধন-মোচন হয়।" সেই দুই ঘটনার বিষয় উল্লেখ করিয়া, কুমার জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা ! আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। বলিদানে বন্ধন-মোচন ? না—মুক্তিদানে বন্ধন-মোচন ?"

মহারাণী বিস্মিত হইয়া কুমারের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

বালকের মুখে এ কি প্রশ্ন ! মহারাণী বুঝিলেন—প্রশ্ন গুরুতর। কিন্তু এবংবিধ প্রশ্নে বালকের নির্ম্মল-চিত্ত কখনই উদ্বেলিত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। তিনি স্থির করিলেন,—সময়ান্তরে কুমারকে বুঝাইয়া এতাদৃশ চিন্তায় বিরত করিবেন। এক্ষণে কুমারকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন,—"এই প্রশ্ন ? আচ্ছা, আমি তোমার এ প্রশ্নের মীমাংসা ক'রে দেব ! এ কথা তুমি এত দিন বল-নি কেন ?" এই বলিয়া, কুমারের হাত ধরিয়া, মহারাণী কুমারকে প্রকোষ্ঠান্তরে লইয়া গেলেন।

ইতি প্রথম খণ্ড।

মণিবেগম।



দ্বিতীয় খণ্ড।



"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥"

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

'বিষয়-চিন্তারত ব্যক্তির বিষয়ে আসক্তি জন্মে। আসক্তি হইতে কামনা, কামনা হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে সদসৎ বিবেকের নাশ, তাহা হইতে স্মৃতি-বিভ্রম, তাহা হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।'



প্রথম পরিচ্ছেদ।

---o---

সূত্রপাত।

"The childhood shows the man
As morning shows the day."

—*Milton.*

হরিদেব রায় আটগ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছেন ; কিন্তু গোপাল ফিরিয়া আসে নাই। গোপালের কথা জিজ্ঞাসা করিলে শান্তিদেবীকে প্রায়ই তিনি প্রবোধ দেন,—"গাপালকে শীঘ্রই তাহারা রাখিয়া যাইবে।" কিন্তু দিনের পর দিন কাটিয়া গেল ; কৈ, গোপাল তো ফিরিয়া আসিল না!

প্রথম প্রথম হরিদেব রায় বুঝাইয়াছিলেন,—"গোপাল রাজা হইবে কি না!—তাই অভিষেক শেষ হইলে গোপাল ফিরিয়া আসিবে!" গোপাল ফিরিল না, অথচ তিনি ফিরিলেন কেন—এবম্বিধ প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে, হরিদেব রায় বলিতেন,—"অভিষেকের সময় আমায় থাকিতে নাই। তাই আমি চলিয়া আসিয়াছি!" শান্তিদেবী প্রথম প্রথম সেই কথাই বিশ্বাস করিতেন ; গোপাল আজি আসিবে, কালি আসিবে বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতেন। কিন্তু মায়ের প্রাণ কত দিন সে প্রবোধ মানিতে পারে?

ভবানীপ্রসাদ ও রামপ্রসাদ এখনও মাতুলালয়ে অবস্থিতি করিতেছে। তাহারা নিকটে থাকিলে, শান্তিদেবীর প্রাণ অনেকটা আশ্বস্ত থাকিত।

কিন্তু তাহারাও তো এখন কাছে নাই! বিষয়-কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকায়, অনবসর-প্রযুক্ত, হরিদেব রায় এ পর্য্যন্ত সে দুই পুত্রকেও আনিয়া দিতে পারেন নাই। তিনি এখন আটগ্রামের নূতন জমিদার হইয়াছেন। জমিদারীর ব্যবস্থা-বন্দোবস্তে তাঁহার সময় কাটিয়া যায়। পুত্রদ্বয়কে আটগ্রামে আনয়ন-সম্বন্ধে কখন আর তিনি বন্দোবস্ত করিবেন? এক জন লোক পাঠাইলেও অবশ্য এতদিন তাহাদের আসার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু নূতন জমিদারী পাইয়া বিষয়-কর্ম্মে তিনি এতই নিবিষ্ট-চিত্ত হইয়া আছেন যে, সে চিন্তা তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। ক্বচিৎ কেহ সে বিষয় স্মরণ করাইয়া দিলেও অল্পক্ষণ মধ্যে সে চিন্তা স্মৃতিপথ হইতে অপসৃত হইয়া যায়। বিষয়াসক্ত মানুষের চিত্ত—এইরূপ ভাবেই অন্য চিন্তা পরিহার করিয়া থাকে। শান্তিদেবী দিন দিন যে মলিন হইয়া পড়িতেছেন, হরিদেব রায়ের সেদিকে এখন দৃষ্টি করিবার অবসর নাই। বিষয়—বিষয়—বিষয়! বিষয় লইয়া তিনি এখন উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

শান্তিদেবী আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার সে রূপ—সে কান্তি দিন দিন মলিন হইয়া আসিতেছে। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে তাঁহার মনে কেবলই এখন গোপালের চিন্তা। 'গোপাল—গোপাল' বলিয়া তিনি পাগল হইয়া উঠিয়াছেন। সংসারের কাজকর্ম্মে মন নাই; কাহারও সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্তি নাই; কেবল গোপালের চিন্তাই তাঁহাকে বিভোর করিয়া রাখিয়াছে। পতি বলিয়াছেন,—'গোপালকে শীঘ্রই তাহারা রাখিয়া যাইবে। তাই তিনি সদাই পথপানে চাহিয়া থাকেন। পথে কাহাকেও চলিতে দেখিলে আগ্রহান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন,—"হাঁ গো! তোমরা আমার গোপালকে আস্‌তে দেখ্‌লে?" নিবিষ্টচিত্তে বসিয়া আছেন; কাহারও পদ-শব্দ শ্রুতিগোচর হইল;—

অমনি মনে করিলেন,—ঐ বুঝি গোপাল আসিতেছে! রাত্রে শুইয়া আছেন; নিশাচর পশুপক্ষীর গমনাগমন-শব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল;—অমনি শশব্যস্তে উঠিয়া বসিয়া আপনা-আপনই বলিয়া উঠিলেন,—"গোপাল! এলি বাবা!"

শান্তিদেবীর ভাববিকৃতি দেখিয়া, কুমুদিনি দেব্যা বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। সংসার কিরূপে রক্ষা হইবে,—সেই চিন্তাই তাঁহার প্রধান চিন্তা। কনিষ্ঠ হরিদেব রায় সংসারের দিকে চাহিয়া দেখেন না; তিনি বিষয়-কর্ম্মে উন্মত্ত হইয়া আছেন। শান্তিদেবীর এই অবস্থা;—তিনি গোপালের জন্য পাগলিনী-প্রায়। সংসার কেমন করিয়া রক্ষা হয়? হরিদেব রায়ের সাক্ষাৎ পাইলে কুমুদিনী দেব্যা সংসারের কথা প্রায়ই উত্থাপন করেন, বুঝাইয়া বলেন,—"আমি একলা আর কত পেরে উঠি? বউয়ের অবস্থা তো এই হ'ল! এখন যা'হক একটা বন্দোবস্ত তো করতে হয়।"

হরিদেব রায় প্রায়ই কোন উত্তর দেন না। যদিও কখনও উত্তর দেন, বলেন,,—"বিষয়-সম্পত্তিটা আগে কায়েমি ক'রে নিই। তার পর বন্দোবস্ত ঠিক হ'য়ে যাবে।" হরিদেব রায়ের মস্তিষ্কে এখন কেবল বিষয়-সম্পত্তিই স্থান পাইয়াছে। তিনি এখন সেই চিন্তাতেই মজগুল হইয়া আছেন। আহারে বসিয়াছেন; তখনও তাঁহার মস্তিষ্ক সেই চিন্তায় আলোড়িত হইতেছে। স্নান করিতে যাইতেছেন, তখনও সেই চিন্তাই তাঁহাকে ঘেরিয়া আছে। তিনি কখনও ভাবিতেছেন,—"উত্তর মাঠের জমিটা হীরু ঘোষকে না দিয়ে, পাঁচু সর্দ্দারকে দিতে হ'বে! সে বেশী টাকা দিতে পারে।" কখনও ভাবিতেছেন,—"বিলের ধারের জমিটা—খাসেই রাখ্‌ব। লোক রেখে আবাদ ক'র্‌তে পার্‌লে, ও জমিটায় সোণা ফলতে পারে।" আবার কখনও বা ভাবিতেছেন,—"আমার দরকার কি

অত ঝঞ্ঝাটে যাওয়ায়? যা পেয়েছি, বুঝে চল্‌তে পার্‌লে, তাতে পায়ের উপর পা দিয়ে কাল কেটে যেতে পারে!"

কুমুদিনী দেব্যা সংসারের বিষয়ে কত সময় কত কথাই বলিবেন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু একমাত্র আহারের সময়টী ভিন্ন কনিষ্ঠের সাক্ষাৎকার-লাভ ঘটিয়া উঠে না। যদি কখনও অন্দরে ডাকিয়া পাঠান, একটা-না-একটা কাজের অজুহাতে হরিদেব রায় আসিতে পারেন না। সুতরাং আহারের সময় ভিন্ন অন্য সময় কোনও কথা কহা ঘটিয়া উঠে না! কিন্তু তাহাতে যে উত্তর পান—চমৎকার! কুমুদিনী দেব্যা যদি জিজ্ঞাসা করেন—"বউয়ের চিকিৎসা-বিষয়ে কি ব্যবস্থা ক'র্‌বে?" 'বিষয়ে'র কথাটাই তখন কেবল হরিদেব রায়ের কর্ণে প্রবেশ করে। তিনি উত্তর দেন,—"কান্তরামের বিষয়টা এখনও হাত ক'র্‌তে পারি-নি।"

দুই জনের মন দুই ভাবের চিন্তায় বিভোর হইয়া আছে। হরিদেব রায় কেবলই দেখেন—বিষয়-সম্পত্তির কি হইতেছে। শান্তিদেবী কেবলই দেখেন—ঐ বুঝি গোপাল আসিতেছে!

রাখাল গোপালের খেলার সাথী ছিল। রাখালকে দেখিলে, শান্তি-দেবীর প্রাণ কতকটা শান্ত হইতে পারে।—এই মনে করিয়া, কুমুদিনী দেব্যা মাঝে মাঝে রাখালকে শান্তিদেবীর কাছে আসিতে বলিতেন। সুযোগ পাইলে, রাখালও তাই মাঝে মাঝে 'কাকি-মা' বলিয়া শান্তিদেবীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইত। শান্তিদেবী তাহাকে কতই আদর-যত্ন করিতেন, আদর করিয়া কত সময় কত-কি খাইতে দিতেন। সময় সময় পয়সা-কড়ি দিতেও ত্রুটি করিতেন না। রাখালও সুযোগ বুঝিয়া শান্তি-দেবীর নিকট কত-কি আব্‌দার করিত। কখনও বলিত,—"ঐ পুতুলটা আমি নেব।" কখনও বলিত,—"ঐ গহনাখানা আমায় দিতে হবে।" কখনও সে শান্তিদেবীর হাতের মুড়কি-মাদুলি-ছড়া লইয়া টানাটানি

করিত, কখনও বা সে তাঁহার নাকের নথটী চাহিয়া বসিত। শান্তি-দেবীও যথাসম্ভব তাহার আব্দার রক্ষার পক্ষে ত্রুটী করিতেন না। সময় সময় আপনার হাতের অলঙ্কারগুলি তিনি রাখালের হাতে পরাইয়া দিতেন; আর সেই অলঙ্কারগুলি পরিয়া রাখাল বাড়ী পলাইয়া যাইত। রাখালের মা কখনও কখনও সেই সকল গহনা ফিরাইয়া দিয়া যাইতেন বটে; কিন্তু রাখালের পিতা হলধর মৈত্র তাহাতে বড়ই বিরক্ত হইতেন। একদিন তাই তিনি রাখালকে নির্জ্জনে ডাকিয়া শিখাইয়া দিলেন,—"এখন থেকে যা তুই আন্‌বি, চুপি চুপি আমার কাছে এনে দিস্!"

একদিন তাহাই ঘটিল। হরিদেব রায়ের বাড়ীতে রাখালের এখন অবাধ গতি। এ-ঘর, ও-ঘর, ঘুরিতে ঘুরিতে রাখাল এক দিন শান্তিদেবীর গহনার বাক্সটি লইয়া পলায়ন করিল। কেহ দেখিতে পাইল না, কেহ জানিতে পারিল না,—এমনভাবে সে কার্য্য সম্পন্ন হইল। শান্তিদেবী গোপালের চিন্তায় অন্যমনা ছিলেন; কুমুদিনী দেব্যা ঘাটে কাপড় কাচিতে গিয়াছিলেন; পরিচারিকা পদ্মমণি বোন্‌-পোর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল। সেদিন এই অবসরে হরিদেব রায়ের গৃহে প্রবেশ করিয়া শান্তিদেবীর গহনার বাক্সটী লইয়া রাখাল পলাইয়া যায়;—সেদিন আর জননীর নিকট উপস্থিত না হইয়া, একেবারে পিতার নিকট গিয়া বাক্সটি প্রদান করে।

যেদিন এই ব্যাপার সংঘটিত হয়, সেদিন গহনার কোনই সন্ধান হয় না। গহনার বাক্স আছে কি নাই, সে দিন সে বিষয়ে কাহারও লক্ষ্য হয় নাই! পরদিন হরিদেব রায় দলিল বাহির করিতে গিয়া দেখিতে পান,—দলিলের সিন্দুকের উপর শান্তিদেবীর গহনার বাক্সটী নাই। সিন্দুক খুলিতে গিয়া গহনার বাক্সের কথা তাঁহার মনে পড়ে। তিনি তখনই কুমুদিনী দেব্যাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করেন,—"দিদি! গহনার বাক্সটা কোথায় গেল?"

কুমুদিনী দেব্যা কোনই উত্তর দিতে পারিলেন না। শান্তিদেবীও কোনও উত্তর দিতে সমর্থ হইলেন না। গহনার বাক্স তবে কোথায় গেল? হরিদেব রায় আতিপাতি সন্ধান করিয়া দেখিলেন,—কোথাও গহনার বাক্স খুঁজিয়া পাইলেন না। চারিদিকে খোঁজ-খোঁজ পড়িয়া গেল! সোর-গোল শুনিয়া, পাড়ার অনেকেই সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

কুমুদিনী দেব্যা শান্তিদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তবে কি বউ, রাখালকে সে বাক্সটা দিয়েছে?"

শান্তিদেবী কহিলেন,—"কৈ—না আমি তো কিছুই জানি না। রাখালকে তো আমি গহনার বাক্স দেই নাই।" কিন্তু সে উত্তরে কুমুদিনী দেব্যার সংশয় দূর হইল না। হরিদেব রায়ের মনেও একটা খট্‌কা বাধিল। তখন রাখালকে ডাকিয়া আনিয়া সেই কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য সকলেরই আগ্রহ হইল।

অন্য দিন রায়েদের বাড়ী কোনরূপ গণ্ডগোল হইলে, রাখাল আপনিই ছুটিয়া আসে। আজ কিন্তু তাহার কোনও সাড়া-শব্দ নাই। তবে কি রাখাল আজ অন্যত্র গিয়াছে? তাহাও তো নহে! একটু সন্ধান করিতেই রাখালকে তাহাদের বাড়ীর মধ্যেই খুঁজিয়া পাওয়া গেল। কিন্তু সে আসিতে চাহিল না। রায়েরা ডাকিতেছে শুনিয়া, তাহার জননী তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া আনিলেন। শান্তিদেবী রাখালকে যে কত আদর করেন, রাখালের জননীর তাহা অবিদিত ছিল না। সুতরাং তিনি রাখালকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিলেন। কিন্তু গণ্ডগোল দেখিয়া তিনি সকলের সম্মুখীন হইতে পারিলেন না। কুমুদিনী দেব্যা তাঁহার নিকট হইতে রাখালকে সকলে সম্মুখে আনিয়া হাজির করিলেন।

হরিদেব রায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"রাখাল! বাবা! গয়নার বাক্সটা কোথায় রেখেছ?"

প্রশ্ন শুনিয়া রাখাল যেন আকাশ হইতে পড়িল। বলিল,—"গয়নার বাক্স কি—কাকাম'শায় !"

হরিদেব। সবাই ব'ল্‌ছে, তুমিই তো নিয়ে গিয়েছ !

রাখাল। কোন্‌ বেটা বলে—আমি নিয়েছি? তার বাপের মুখে কুকুরে পেচ্ছাব করুক !

রাখালের মুখে তুব্‌ড়ি ছুটিতে লাগিল। যাহা মুখে আসিল, তাই বলিয়া গালাগালি দিতে দিতে, রাখাল সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গেল। বিশেষ কোনও প্রমাণ নাই দেখিয়া, হরিদেব রায়ও তাহাকে আর ততটা পীড়াপীড়ি করিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ, রাখালের জননী যখন বলিলেন,—তিনি এ বিষয়ে কিছুই জানেন না, রাখাল কোনও কিছু লইয়া গেলে তিনি নিশ্চয় তাহা ফিরাইয়া দিয়া যাইতেন; তখন আর রাখালকে পীড়াপীড়ি করিতে রায়-পরিবারের কাহারও প্রবৃত্তি হইল না।

পদ্মমণি কিন্তু তখনও জোর করিয়া বলিল,—"রাখাল ছাড়া এ কাজ আর কারও দ্বারা হয়-নি। ওটা যেদিন থেকে বাড়ী ঢুক্‌তে আরম্ভ ক'রেছে, আমি সেইদিন থেকেই টিক্‌টিক্‌ ক'র্‌ছি; ব'ল্‌ছি,—'সাবধান ! রাখালটাকে ঘরে ঢুক্‌তে দিও না—বউ মা !' কিন্তু আমার কথা তোমরা শুন্‌বে কেন? আমি দাসী-বাঁদী বৈ তো নয় !"

রাখালের ঠাকুর-মা গণ্ডগোল শুনিয়া রায়েদের বাড়ীতে শুভাগমন করিয়াছেন। রাখালের সম্বন্ধে পদ্মমণির এবম্বিধ উক্তি শ্রবণ করিয়া তিনি তেলে-বেগুনে জ্বলিতে লাগিলেন; হাত-মুখ নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন—"কি-লা! এত বড় আস্পর্দ্ধা! যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! জমিদার আছে—তোর মনিবই আছে। তাই ব'লে তুই যাকে তাকে যা তা ব'ল্‌বি? এখনই নুড়ো জ্বেলে মুখ পুড়িয়ে দে'ব।"

পদ্মমণিই বা হটিবে কেন? সে মনে করে, সে তো কাহারও

আটচালায় চাল বাঁধে নাই! সুতরাং পদ্মমণিও লম্ফ-ঝম্প প্রদান করিয়া, রাখালের ঠাকুর-মার মুখের উপর হাত ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বলিতে লাগিল, —"জানি-নে আর কি? তোদের ঘরের কথা কি আর না জানি? দশে-ধর্ম্মে জানে—দেশে-বিদেশে জানে। তোর পোড়ার মুখ—তাই আবার দেখাতে এসেছিস্। আমি নিশ্চয় ব'ল্ছি রাখাল ছাড়া এ কাজ আর কারও দ্বারা হয়-নি!"

রাখালের ঠাকুর-মা এবার আরও চটিয়া উঠিলেন। পদ্মমণিকে লক্ষ্য করিয়া 'নভূত-নভবিষ্যৎ' গালাগালি পাড়িতে লাগিলেন,—"হারামজাদী! —নচ্ছার!—পাজী!—আমার রাখাল চোর! ফের ব'ল্বি তো ঝাঁটা পেটা ক'র্ব—তা জানিস্?"

পদ্মমণির আর সহ্য হইল না। রাখালের ঠাকুর-মা যাহা মুখে বলিলেন, পদ্মমণি এখন তাহা কাজে দেখাইতে প্রবৃত্ত হইল। গালাগালি শুনিয়া, লম্ফ-ঝম্প দিয়া, গোয়াল-ঘর হইতে ঝাঁটা-গাছটা লইয়া আসিল; আর সেই ঝাঁটা লইয়া রাখালের ঠাকুর-মার প্রতি ধাবমান হইল; বলিতে লাগিল,—"তবে রে শতেক-খোয়ারী! দেখি, তোর কোন্ বাবা তোকে রক্ষা করে!"

হরিদেব রায় পদ্মমণিকে বাধা দিলেন; বকিতে লাগিলেন। এদিকে, পদ্মমণির বিক্রম দেখিয়া, রাখালের ঠাকুর-মা ছুটিতে ছুটিতে আপনার বাড়ীর দিকে প্রস্থান করিলেন।

হরিদেব রায় পদ্মমণিকে বাধা প্রদান করায়, পদ্মমণির অভিমান-সাগর উথলিয়া উঠিল। নাকি-সুরে কাঁদিতে কাঁদিতে পদ্মমণি বলিতে লাগিল, —"আমি আর তোমাদের বাড়ীতে থাক্‌ব না। আমায় যে-সে এসে তোমাদের সাম্‌নে যা-তা ব'লে যাবে, তোমরা কেউ কিছু ব'ল্‌বে না। আমি এই চ'ল্‌লাম!"

সকল সময় কি সকল আব্দার শোভা পায়? একে গহনার বাক্স অপহৃত হওয়ায়, হরিদেব রায়ের অন্তরাত্মা শুকাইয়া গিয়াছে। তাহার উপর আবার পদ্মমণি, মৈত্র মহাশয়ের জননীকে অপমান করিয়াছে। এ অবস্থায় কি আর পদ্মমণির আব্দার সহ্য হয়?

পদ্মমণি বলিতে-না-বলিতেই হরিদেব রায় বলিলেন,—"দূর-হ বেটী! তুই আমার বাড়ী থেকে এখনই দূর-হ'! কি ব'ল্‌ব—তুই স্ত্রীলোক! নইলে ঐ ঝাঁটাপেটা ক'রে আমি তোকে এখনই বাড়ী থেকে দূর ক'রে দিতাম!"

পদ্মমণি কাঁদিতে কাঁদিতে অভিমান-ভরে খিড়কীর দিকে চলিয়া গেল। হরিদেব রায় বাড়ীর সকলের উদ্দেশে গালিবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

এক দিকে হরিদেব রায়ের বাড়ীতে এই ব্যাপার; অন্য দিকে রাখালের ঠাকুর-মা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বাড়ী ফিরিয়া গিয়া, আপনার পুত্রের নিকট কান্না আরম্ভ করিয়া দিলেন,—"তোরা সব জল-জ্যান্ত বেঁচে থাকৃতে, আমায় কিনা হরিদেব রায় একটা চাকরাণী দিয়ে এই রকম অপমান করালে! এর প্রতিকার যদি আজই তোরা না করিস্, আমি এখনই আত্মহত্যা ক'র্‌ব।" এই বলিয়া হলধর-জননী, মাটিতে মাথা ঠুকিয়া, উচ্চ চীৎকারে বাড়ী প্রকম্পিত করিয়া তুলিলেন।

পাড়ার দুই একটী মহিলা আসিয়াও তাহাতে রসান দিতে লাগিল হলধর মৈত্র ক্রোধান্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন,—"একবার দেখ্‌ব—বেটা কেমন জমিদার হ'য়েছে!"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—o—

রাখালের কথা।

"Obtruding false rules prankt in reason's garb."

—*Milton.*

সেই দিন হইতে মুখ-দেখা-দেখি বন্ধ হইল। সেই দিন হইতে রায়-পরিবারের সহিত মৈত্র-পরিবারের সদ্ভাব টুটিয়া গেল। সেই দিন হইতে হরিদেব রায়ের শত্রুতা-সাধনে হলধর মৈত্র বদ্ধপরিকর হইলেন।

এখন প্রায় প্রতিদিনই হলধর মৈত্রের বাড়ীতে হরিদেব রায়ের অনিষ্ট-সাধন-বিষয়ে গুপ্ত পরামর্শ হয়। কখনও হরিদেব রায়কে সমাজ-চ্যুত করিবার কথা উঠে; কখনও হরিদেব রায়ের প্রজাকে গোপনে ডাকাইয়া আনিয়া খাজানা দিতে নিষেধ করা হয়।

আজিও হলধর মৈত্রের বাড়ীতে সেইরূপ একটা চক্রান্তের পরামর্শ চলিয়াছে। গহর আলি সর্দ্দার—হরিদেব রায়ের একজন মাতব্বর প্রজা। লোকটা বড়ই দুর্দ্দান্ত। সে যখন নাটোর-রাজের প্রজা ছিল, তখনই সময় সময় তহশীলদারদিগকে হাঁকাইয়া দিত। এখন হরিদেব রায় তাহার জমিদার হওয়ায় সে যেন আরও সুযোগ পাইয়া বসিয়াছে। হলধর মৈত্র সে সন্ধান পূর্ব্বেই অবগত ছিলেন। সুতরাং অনলে ঘৃতাহুতি প্রদানের অভিপ্রায়ে তিনি আজ গহর আলি সেখকে ডাকাইয়া আনিয়াছেন; উৎসাহ দিয়া বলিতেছেন,—"দেখ গহর আলি! আমি জানি,

এ অঞ্চলে তুমিই একজন তেজস্বী লোক। নূতন জমিদার হ'য়ে হরিদেব রায় ধরাখানাকে যেন সরার মত দেখ্‌ছে! তুমি যদি এর প্রতিকার ক'র্‌তে পার, লোকে দু'হাত তুলে তোমায় আশীর্ব্বাদ ক'র্‌বে।"

গহর আলি মন বুঝিবার জন্য কহিল,—"কি জানেন মৈত্র ম'শায়! হাজার হ'ক্‌, তিনি তো মনিব বটেন! এ পর্য্যন্ত তিনি তো আমার কোনও অনিষ্ট করেন-নি! আমি কি ক'রে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ ক'র্‌ব?"

হলধর। তুমি কি না বড় শক্ত লোক, তাই তোমার কাছে ঘেঁস্‌তে পারে না। নইলে, তুমি একবার গাঁয়ের মধ্যে তত্ত্ব নিয়ে দেখ, হরিদেব রায়ের অত্যাচারে লোক দেশ ছেড়ে পালাতে আরম্ভ ক'রেছে। সে দিন আবদুল মিঞার ঘরখানা দিন-দুপুরে ধু-ধূ করে জলে গেল, তার নিগূঢ় তত্ত্ব কিছু জান কি?

গহর আলি। না! কৈ, তা তো আমি কিছু শুনি-নি। আমি তো শুনেছি, আবদুল মিঞার বড় বেটা ছামদু তামাক খেয়ে ক'ল্‌কেটাকে বেড়ার কাছে রেখেছিল; হাওয়া পেয়ে সেই আগুন জ্বলে উঠে ঘরখানায় লেগে গিয়েছিল। সে কথা কি তবে ঠিক নয়?

হলধর। ব'ল্‌ব আর কি ক'রে—সর্দ্দারের বেটা! ব'ল্‌তে এখন বড়ই শঙ্কা হয়! হরিদেব রায় এখন আটগ্রামের জমিদার! কি কথা ব'ল্‌তে কি ঘ'টে যাবে,—তাই মনে ভয় হয়! তবে তুমি অতি সজ্জন লোক, তাই তোমাকে দু'টো প্রাণের কথা ব'ল্‌তে সাহস হয়! নইলে, আর কাউকে এ সকল কথা বল্‌তে পারি কি?

গহর আলি। তবে আবদুল মিঞার বাড়ী জ্বালার মধ্যে কোনও রহস্য আছে নাকি?

হলধর। রহস্য?—রহস্য ষোল আনাই! তুমি সাদাসিদে মানুষ; প্যাঁচ ফের কিছু বোঝ না। তাই তুমি যা শুনেছ, তাই বিশ্বাস ক'রেছ!

কিন্তু আমার স্বচক্ষে দেখা! আমি কি ক'রে অন্য কথা বিশ্বাস ক'র্‌তে পারি?

গহর আলি। বলেন কি? আপনি স্বচক্ষে দেখেছেন!

গহর আলি সর্দ্দার বিস্মিত হইয়া মৈত্র মহাশয়ের মুখপানে চাহিয়া রহিল।

হলধর মৈত্র বুঝিলেন,—ঔষধ একটু ধরিয়াছে। তিনি আরও একটু জোরের সহিত বলিলেন,—"আমি স্বচক্ষে না দেখ্‌লে কি আর এমন ক'রে ব'ল্‌তে সাহস পাই! জানই তো হরিদেব রায় আমার কত আত্মীয়! তবু যে আমি তার বিরুদ্ধে এমন কথাটা ব'ল্‌ছি, বিশেষ কোনও কারণ না থাক্‌লে কি আর মিথ্যা ক'রে ব'ল্‌তে পারি? ব'ল্‌তে কি গহর, আবদুল মিঞার ঘর-জ্বালানর পর থেকেই হরিদেব রায়ের প্রতি আমার দারুণ ঘৃণা হ'য়েছে। পয়সার লোভে কি এমন ক'রে একজনকে উদ্বাস্তু করা উচিত? হরিদেব রায় যে রকম আরম্ভ ক'রেছে, কোন্ দিন বা তোমার-আমারও কি সর্ব্বনাশ ক'রে ব'স্‌বে! গহর!—তুমি যদি এর কোনও প্রতিকার ক'র্‌তে পার, ভাল, আমি এ গ্রামে থাকি। নয় তো এ পৈত্রিক ভিটে ত্যাগ ক'রে আমায় অন্য দেশে পালাতে হয়!"

গহর আলি আর অবিশ্বাস করিতে পারিল না। আবদুল তাহার আত্মীয় লোক। হরিদেব রায় সেই আবদুলের বাড়ী পুড়াইয়া দিয়াছে, আর হলধর মৈত্র স্বচক্ষে তাহা দেখিয়াছেন;—ইহাতে গহরের প্রাণের ভিতর রোষ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। গহর বলিল,—"এ যদি হয়, তা হ'লে তো আর এদেশে বাস করাই চলে না!"

সুরে সুরে মিশাইয়া হলধর মৈত্র বলিয়া উঠিলেন,—"আমিও তো তাই ব'লছিলাম! তোমার মত লোক দেশে থাক্‌তে, এ অত্যাচারের যদি প্রতিকার না হয়, তবে আর কোন্ সাহসে দেশে থাক্‌ব?"

গহর আলি উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল,—"সত্যই বলেছেন আপনি! এর প্রতিকার ক'র্‌তেই হবে!"

গহর আলি এই পর্য্যন্ত বলিয়াছে, এমন সময় ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে দৌড়িতে রাখাল বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার পিছু পিছু চারি পাঁচ জন স্ত্রী-পুরুষ হাঁপাইতে হাঁপাইতে বহির্ব্বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

হলধর মৈত্র বুঝিলেন—ব্যাপার গুরুতর। বুঝিলেন,—রাখাল নিশ্চয় কাহারও কিছু অনিষ্ট করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু সে কথা পাছে গহর আলি বুঝিতে পারে. তাই তিনি, কাহাকেও কিছু না কহিয়া, পূর্ব্বেই গহর আলিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"দেখ্‌লে গহর!—ব্যাপারখানা একবার দেখ্‌লে? এই দেখ,—চোখের উপর দেখ! একটা ছেলে আমার; তার উপর কি অত্যাচার! একবার দেখে যাও তুমি! এতে কি আর এ গ্রামে বাস করা চলে? তুমি নিশ্চয়ই জেন,—এ সব সেই হরিদেব রায়ের চক্রান্ত!"

গহর বলিল,—"আমি সব বুঝেছি। আমায় আর কিছু ব'ল্‌তে হ'বে না। আজ আমি এখন আসি। পরশু সন্ধ্যার পর, এ বিষয়ে একটা হেস্ত-নেস্ত করা যাবে!"

গহর আলি চলিয়া গেল। রাখলের অনুসরণকারিগণ হলধর মৈত্রের সম্মুখে আসিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল,—"তোমরা কি আর আমাদের গাঁয়ে থাক্‌তে দেবে না?"

হলধর মৈত্র সান্ত্বনা-দানচ্ছলে কহিলেন,—"কেন—কি হয়েছে? বলই না শুনি।"

তারিণীর মা সকলের আগবাড়া হইয়া কহিতে লাগিল,—"আমার দুখীকে কি মারটা মেরে এয়েছে, একবার দেখ্‌বে এস! ছুঁড়িটের নাক দিয়ে গল্‌গল্ ক'রে রক্ত প'ড়ছে। এমন মারও কি মানুষে মারে?"

হলধর মৈত্র যেন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে মেরেছে, কেন মেরেছে?"

তারিণীর মা। আর কে মারবে,—তোমার ঐ গুণধর ছেলে! অমন ছেলে বেঁধে রাখতে পার না?

সঙ্গে সঙ্গে হরমণি হাত-মুখ নাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল,—"যেন কিছু জানেন না! ন্যাকা আর কি! ছুঁড়িটাকে বেদম মেরেছে। মেরে আবার তার হাতের পৈচে ছড়া কেড়ে নিয়ে এল গা?"

তারিণীর মা ও হরিমণি ক্রমশঃ অনেক রূঢ় কথা কহিতে আরম্ভ করিল। আর আর যাহারা সঙ্গে ছিল, তাহারাও আস্ফালন করিতে লাগিল। গণ্ডগোল শুনিয়া, নিমাই মণ্ডল সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

নিমাই মণ্ডল আসিয়া প্রথমে গণ্ডগোল থামাইবার চেষ্টা পাইল। তারিণীর মা ও হরিমণিকে লক্ষ্য করিয়া কহিল,—"তোরা একটু আস্তে কথা কইতে পারিস্‌নে। কার সঙ্গে কি ভাবে কথা কইতে হয়, সে জ্ঞানটা তোদের নেই! তোরা একটু থাম বাপু! কর্ত্তা মশায়কে কথাটা একবার শুন্‌তে দে।"

নিমাই মণ্ডল বলিতেছে। সুতরাং হরিমণি ও তারিণীর মা শান্ত হইল। নিমাই মণ্ডল গ্রামস্থ নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যে একজন মাতব্বর ব্যক্তি। হলধর মৈত্রও তাহাকে বিশেষ খাতির করেন।

নিমাই মণ্ডল কহিল,—"ঠাকুর ম'শায়! আপনার ছেলের জন্য আমাদের গ্রামে টেকা দায় হ'য়েছে। সেদিন আবদুল মিঞার ঘরখানায় আপনার ছেলেই আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। আপনাকে আমরা মান্য করি ব'লে, জান্‌তে পেরেও সে কথা প্রকাশ করি-নি। আজ আবার কি ক'রে এল, শুন্‌তেই তো পাচ্ছেন। আপনাদের ছেলে-পিলেকে

আমরা তো কিছু ব'ল্‌তে পারিনে! কিন্তু সকল লোক তো সমান নয়! কোন্ দিন কে রাগের মাথায় কি ক'রে ব'স্‌বে, তখন আপনি আমাদের দোষ দিতে পার্‌বেন না। রোজ রোজ এমন অত্যাচার ক'র্‌লে কে সইতে পারে?"

গগন দাস যুবাপুরুষ; সম্পর্কে দুখীর খুড়া হয়; রাগে গরগর করিতেছিল। নিমাই মণ্ডলের কথা শেষ হইতে না হইতে বলিয়া উঠিল,—"আমি যদি আজ রাখালেটাকে ধ'র্‌তে পার্‌তাম, টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেল্‌তাম!"

নিমাই মণ্ডল একটু রুক্ষস্বরে তাহাকে নিরস্ত করিবার জন্য কহিল, —"থাম্! আর বকিস্‌নে!"

গগন দাস নিরস্ত হইল। নিমাই মণ্ডলের নম্রভাব দেখিয়া হলধর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন, কি হয়েছে নিমাই! খুলেই ব'ল না কেন?"

নিমাই মণ্ডল একে একে সকল কথা বিবৃত করিল। দুখীকে বিষম প্রহার, তাহার হাত হইতে পৈঁছা ছিনাইয়া লওয়া, তাহাকে ফেলিয়া দিয়া পৈছা লইয়া ছুটিয়া পলায়ন করা,—একে একে রাখালের সকল কীর্ত্তি-কাহিনী নিমাই মণ্ডল বর্ণনা করিয়া গেল। কেবল একদিনের কথা নহে; কোন্ দিন রাখাল কি করিয়াছে,—কোন্ দিন সে সনাতন দাসের আম গাছ হইতে আম পাড়িয়া আনিয়াছিল,—কোন্ দিন সে যুধিষ্ঠির ঘোষের দুধের কলসীতে মূত্রত্যাগ করিয়াছিল,—কোন্‌দিন সে অর্জ্জুন পরামাণিকের ঘরে ঢুকিয়া চাল-দাল ছড়াইয়া দিয়াছিল,—একে একে সকল বিষয়ই উল্লেখ করিল। শেষ বলিল,—"এখন আজকের বিষয়টা আপনি বিচার করুন। দুখীর পৈছে ছড়টা আনিয়ে দেন।"

নিমাই মণ্ডল আসিয়াছে; তাহাকে অসন্তুষ্ট করিলে, ভবিষ্যতে নানা অমঙ্গলের সম্ভাবনা আছে।—এইরূপ সাত-পাঁচ ভাবিয়া, হলধর মৈত্র

একটু রোষভরে পুত্র রাখালকে ডাকিতে লাগিলেন। বলিলেন,—"পাজি ছেলে, নচ্ছার ছেলে! আজ হাড় একঠাঁই, আর মাস এক ঠাঁই ক'রব।"

আগন্তুকগণ বুঝিল,—মৈত্র মহাশয় আজ সত্য-সত্যই চটিয়াছেন। তাহাদের মনে হইল,—আজ সত্য-সত্যই কোনও প্রতিকার হইবে। সুতরাং তাদের উত্তেজনা একটু কমিয়া আসিল।

পুনঃপুনঃ মৈত্র মহাশয় রাখালকে ডাকিতে লাগিলেন রাখাল কোনই উত্তর দিল না; সে কেবল ঠাকুর-মার অঞ্চলকোণে লুকাইবার চেষ্টা পাইতে লাগিল। রাখালের ঠাকুর-মা সকলই বুঝিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার মনে হইল, এ সময় হলধর যেরূপ রাগান্বিত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার সহায়তা ভিন্ন রাখালের আজ আর নিস্তার নাই। তাই তিনি আপনিই রাখালকে সঙ্গে লইয়া, বহির্ব্বাটীতে আগমন করিলেন।

রাখালকে দেখিয়া হলধর মৈত্র আস্ফালন করিয়া তাহাকে গালাগালি দিয়া উঠিলেন।

রাখালের ঠাকুর-মা পুত্র হলধরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন! রাখাল কি ক'রেছে যে, তুই অমন ক'রছিস্?"

হলধর মৈত্র কতই রাগভাব প্রকাশ করিলেন। কহিলেন,—"জান না? ঐ শোন—নিমাই মণ্ডলের মুখে শোন!" এই বলিয়া, নিমাই মণ্ডলের নিকট তিনি যাহা শুনিয়াছিলেন, একে একে সকল কথা কহিয়া গেলেন।

রাখালের বিশ্বাস ছিল,—"সে যতক্ষণ ঠাকুর-মার নিকট আছে, ততক্ষণ তাহার গায়ে কেহ আঁচড়টি পর্য্যন্ত দিতে পারিবে না।' সেই সাহসই—তাহার প্রধান সাহস। সেই সাহসে ভর করিয়া, রাখাল ঠাকুর-মাকে বলিল, "না ঠাকুর-মা, কৈ আমি তো কিছুই করি-নি।"

রাখালের ঠাকুর-মাও সেই সুরে সুর মিলাইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"হাঁ,

তাই তো! রাখাল তো আজ বাড়ীর বাইরেই যায়-নি; ও তো আজ বাড়ীতে ব'সেই খেলা কর্‌ছে!"

রাখালের ঠাকুর-মার এই উত্তরে, তারিণীর মা ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিল না। সে বলিতে গেল,—"এই তো রাখালেটা ছুটতে ছুট্‌তে বাড়ী ঢুক্‌লো! চোখের মাথা কি সব খেয়ে ব'সেছ?"

নিমাই মণ্ডল তারিণীর মাকে গালি দিয়া উঠিল; সাবধান করিবার উদ্দেশ্যে কহিল,—"কার সঙ্গে কি রকম কথাবার্ত্তা কইতে হয়—তা যখন জানিস্‌নে, তখন কথা কইতে যাস্‌ কেন?" এই বলিয়া, মৈত্র-মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া, নিমাই মণ্ডল কহিল,—"মা-ঠকরুণ কাজ-কর্ম্মে ব্যস্ত ছিলেন; তাই হয়-তো দেখ্‌তে পান-নি। নৈলে রাখাল যে দুখীকে ফেলে দিয়ে তার পৈঁছা ছড়া নিয়ে এয়েছে, তা কে না দেখেছে?"

রাখাল আবার বলিল—"আমি নিই-নি।" রাখালের ঠাকুর-মাও বলিলেন,—"রাখাল যদি নেবে, তা হ'লে পৈঁছা গেল কোথায়?"

হলধর মৈত্র মনে মনে সকলই বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু রাখালও পৈঁছার কথা অস্বীকার করিতেছে; আর জননীও রাখালের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাহার কথাই সমর্থন করিতেছেন। সুতরাং এ সুযোগ তিনি কি পরিত্যাগ করিতে পারেন? তথাপি নিমাই মণ্ডলের মন রক্ষার জন্য বলিলেন,—"দেখ নিমাই! রাখালও অস্বীকার ক'র্‌ছে; মাও বল্‌ছেন, —রাখাল পৈঁছা আনে-নি। এ অবস্থায় কি কর্‌তে পারা যায়? তা যাই হোক, আমি তল্লাস ক'রে দেখ্‌ব—তুমি এখন সকলকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাড়ী নিয়ে যাও। যদি পৈঁছা আমার বাড়ীতে এসে থাকে, তুমি নিশ্চয় জেন,—আমি তোমার কাছে তা পৌঁছে দেব। তবে যদি বাড়ীতে না এসে থাকে, তা হ'লে আর—"

হলধর মৈত্র আম্‌তা আম্‌তা করিতে লাগিলেন।

নিমাই মণ্ডল কহিল,—"আপনার বাড়ীতেই পৈঁছা এয়েছে। তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই। যেমন ক'রে হোক,সে পৈঁছা-ছড়া খুঁজে দিতে হবে।"

"আচ্ছা তা—তা—তা তোমরা এখন যাও। আমারই অদেষ্টে দণ্ড আছে দেখ্‌ছি!"

হলধর মৈত্র এইরূপ ভাবের কথা-বার্ত্তা কহিয়া, নিমাই মণ্ডল প্রভৃতিকে বিদায় দিবার চেষ্টা পাইলেন।

তারিণীর মা কিন্তু সে কথা শুনিতে চাহিল না। সে বলিল,—"খোঁজাখুঁজির ধার ধারিনে। পৈঁছে এখনই দিতে হবে। এই মাত্র নিয়ে এল; তার আবার খোঁজাখুঁজি কি ?"

কিন্তু মৈত্র মহাশয় এমনই মিষ্ট ভাষায় নিমাই মণ্ডলকে তুষ্ট করিলেন যে, নিমাই মণ্ডল আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিল না। অন্যান্য সকলে সে কথা শুনিতে না চাহিলেও, হলধর মৈত্রের অনুরোধে নিমাই মণ্ডল সকলকে বুঝাইয়া লইয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—o—

বিষ-বীজ।

ইন্দ্রিয়ানাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি॥

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

প্রায় প্রতিদিনই পুত্রের জন্য পিতামাতাকে লোকের লাঞ্জনা-গঞ্জনা সহ্য করিতে হয়। সহিয়া সহিয়া অসহ্য হওয়ায়, হলধর মৈত্র একদিন

পুত্রকে একটু তিরস্কার করিলেন; কহিলেন,—"গোপাল আর তুই—এক সঙ্গের খেলার সাথী ছিলি। সে রাজা হইতে চলিল; আর তুই লোকের তিরস্কার-গঞ্জনার পাত্র হইলি! নিজের অবস্থার উন্নতি-সাধনে তোর একটুও চেষ্টা নাই?"

গোপাল রাজা হইয়াছে, আর রাখাল লোকের নিকট পদে পদে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইতেছে,—ভৎর্সনা করিয়া হলধর মৈত্র যেদিন এই কথা কহিলেন; রাখালের মন একটু চঞ্চল হইল। পিতা আর আর যাহা কিছু বলিলেন, সে সকল কথা রাখালের কর্ণে স্থান পাইল না। রাখাল সকল কথাই শুনিল বটে; কিন্তু এই কথাটি তাহার হৃদয়ের অন্তস্তলে গিয়া আঘাত করিল। এই দিন হইতে রাখাল সদাই ভাবিতে লাগিল,—'কি করিয়া গোপালের ন্যায় রাজৈশ্বর্য্যের অধিকারী হইতে পারি।'

যতই দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেল, রাখালের প্রাণের ভিতর সেই চিন্তা সেই আকাঙ্ক্ষা পল্লবিত মুকুলিত হইতে লাগিল।

ইতিমধ্যে নাটোর রাজধানী হইতে এক নিমন্ত্রণ-পত্র আসিল। মহারাণী ভবানী সেই নিমন্ত্রণ-পত্রে ব্রাহ্মণগণকে রাজধানীতে পদধূলি প্রদানের জন্য আহ্বান করিয়াছেন। রাখাল মনে মনে স্থির করিল,—"এই এক অবসর বটে! গোপাল আমার খেলার সাথী ছিল। একটী ফল খেতে পেলে, সে তাহার অর্দ্ধেক আমাকে না দিয়া খেত না; এক মুঠো মুড়ি খেতে পেলে, অর্দ্ধেক সে আমার জন্য রেখে দিত। সে এখন অতুল সম্পত্তির অধীশ্বর—সে সম্পত্তির কিছু অংশ আমায় দিতে পারে না কি?"

এই ভাবিয়া, নিমন্ত্রণ উপলক্ষে নাটোর-রাজধানীতে গিয়া রাখাল একবার গোপালের সহিত সাক্ষাৎ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। মনে মনে

কহিল—"আমি স্পষ্ট করিয়া সকল কথা গোপালকে খুলিয়া বলিব। শৈশবের সকল কথা তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিব। তাহা হইলে, নিশ্চয় সে তাহার রাজত্বের কতক অংশ আমায় প্রদান করিবে।"

এইরূপ ভাবনায় বিভোর হইয়া, রাখাল যখন ঐশ্বর্য্যের সুখস্বপ্ন দেখিতে লাগিল, আশার আলোকে কখনও তাহার হৃদয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, কখনও বা নৈরাশ্যের মেঘ আসিয়া তাহার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিল। একবার তাহার মনে হইল,—"গোপাল আমার আশা পূর্ণ করিবে; সে কখনই আমার প্রার্থনায় উপেক্ষা করিতে পারিবে না।" পরক্ষণেই আবার তাহার মনে হইল,—"যদি গোপাল আমার প্রার্থনা পূরণ না করে, ঐশ্বর্য্য-মদে মত্ত হইয়া সে যদি আমার প্রতি উপেক্ষা করে।" রাখাল আপনা-অপনিই সে প্রশ্নের মীমাংসা করিল,—"উপেক্ষা করে, রাজ্য না দেয়, অন্য পথ আছে। আমার সঙ্কল্প,—যেমন করিয়া হউক, গোপালের সম্পত্তির—গোপালের ঐশ্বর্য্যের কতক অংশ আমায় হস্তগত করিতে হইবে।"

ঈর্ষ্যানলে রাখালের হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল। রাখাল মনে মনে কহিতে লাগিল,—"গোপাল অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর, আর আমি পথের ভিখারী! ইহা কখনই সহ্য হইবে না। ছলে বলে কৌশলে যেমন করিয়া হউক অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতেই হইবে।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—o—

ব্রাহ্মণ।

"কোটিব্রহ্মাণ্ডমধ্যেষু সন্তি তীর্থানি যানি বৈ।
তীর্থানি তানি সর্ব্বাণি বসন্তি দ্বিজপাদয়োঃ॥"

—পদ্মপুরাণ।

পোষ্যপুত্র-গ্রহণ-উৎসবের সমারোহ ব্যাপার শেষ হইতে না হইতেই নাটোর রাজধানী আবার এক উৎসব-সমারোহে মুখরিত হইয়া উঠিল।

প্রতিদিন সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত দেশ-দেশান্তর হইতে ব্রাহ্মণগণ আসিয়া নাটোর-রাজধানীতে সমবেত হইতেছেন। ব্রাহ্মণগণ বলিতে—কেবল যে নৈয়ায়িক, বৈদান্তিক বা স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ আসিয়া উপস্থিত হইতেছেন, তাহা নহে। ব্রাহ্মণগণ বলিতে—কেবল যে রাজ-বাটীর সংশ্রব-যুক্ত ব্রাহ্মণগণ আসিতেছেন, তাহা নহে। ব্রাহ্মণগণ আসিতেছেন,—গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে—দেশ-দেশান্তর হইতে। বৃদ্ধ আসিতেছেন, যুবা আসিতেছেন, প্রৌঢ় আসিতেছেন, বালক আসিতেছেন,—উপনীত উপবীতধারী ব্রাহ্মণ-মাত্রেরই নাটোর-রাজধানীতে এ উৎসবে সমাদরের অবধি নাই। মহারাণীর দেওয়ান দয়ারাম রায় ও মহারাণীর মাতুলপুত্র চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর, সকল রাজকর্ম্মচারিগণকে সঙ্গে লইয়া, প্রাণপণযত্নে দিবা-রাত্রি ব্রাহ্মণগণের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত আছেন। নাটোর-রাজধানীতে এতাধিক ব্রাহ্মণের সমাগম আর কখনও হয় নাই; এবং

সমাগত সকল ব্রাহ্মণের সমভাবে এরূপ পরিচর্য্যার ব্যবস্থাও আর কখনও হয় নাই।

এতাধিক ব্রাহ্মণের সমাগম, আর সকল ব্রাহ্মণের সমভাবে পরিচর্য্যার ব্যবস্থা,—এ আবার কি নূতন উৎসব! মহারাণী ভবানী মনস্থ করিয়াছেন—লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি গ্রহণ করিবেন। লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি-সংগ্রহে যে কি পুণ্য, মহারাণী অনেক দিন পূর্ব্বে আপন গুরুদেবের মুখে তাহা শুনিয়াছিলেন। লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি সংগ্রহ করিতে পারিলে, সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়, সর্ব্বত্র বিজয় লাভ হইয়া থাকে। সে পদধূলি অঙ্গে ধারণ করিলে; দেহ সর্ব্বরোগ হইতে মুক্তিলাভ করে। সেই ধূলি যিনি সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন; অশেষ পুণ্যভাগী হইয়া তিনি অক্ষয় স্বর্গ লাভ করেন। গুরুদেবের নিকট সেই কথা শুনিয়া অবধি-লক্ষ-ব্রাহ্মণের পদধূলি-সংগ্রহে মহারাণী সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। অনেক দিন হইতে সে সঙ্কল্প তাঁহার মনে জাগরূক ছিল। আজ মহারাণী সেই সঙ্কল্প সিদ্ধ করিবেন। তাই আজ দেশ-দেশান্তর হইতে ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনয়ন করিয়াছেন,—তাই আজ ব্রাহ্মণ-মাত্রেরই বিশেষ পরিচর্য্যার ব্যবস্থা হইয়াছে।

নির্দ্দিষ্ট তিথি-লগ্নে লক্ষ ব্রাহ্মণকে এক স্থানে ভিন্ন ভিন্ন আসনে বসাইয়া, তাঁহাদের পদধূলি গ্রহণ করিতে হয়। লক্ষ ব্রাহ্মণের বসিবার জন্য তাই লক্ষাধিক কাষ্ঠাসন নির্ম্মিত হইয়াছিল;—লক্ষ ব্রাহ্মণের অবস্থানের জন্য তাই বহুবিস্তৃত মণ্ডপসমূহে সহরের শোভা-সম্বর্দ্ধন করিয়াছিল। পদধূলি-গ্রহণ-উপলক্ষে মহারাণী প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে যথাযোগ্য পাথেয় প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; এবং এই পদধূলিদান-উপলক্ষে ব্রাহ্মণগণ সকলেই উপযুক্ত-রূপ বিদায়-সম্মানে সম্মানিত হইয়াছিলেন।

শুভ বৈশাখের রামনবমী তিথিতে এই পদধূলি-গ্রহণোৎসব আরম্ভ

হয়। তাহার পূর্ব্বেই লক্ষাধিক ব্রাহ্মণ নাটোরে আসিয়া উপনীত হইয়াছিলেন। পদধূলি-গ্রহণোৎসব যে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য,—বর্ণনায় তাহা বুঝাইবার নহে। অর্দ্ধ-বঙ্গেশ্বরী মহারাণী ভবানী, কুমার রামকৃষ্ণকে সঙ্গে লইয়া, দীনা ভিখারিণীর ন্যায় ব্রাহ্মণগণের পদতলে বিলুণ্ঠিত হইতেছেন; আর ব্রাহ্মণগণ—বালক, বৃদ্ধ, যুবা, প্রৌঢ়—সকলেই চরণ-ধূলি দানে তাঁহাদিগকে শুভাশীর্ব্বাদ করিতেছেন।—সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! মহারাণী প্রত্যেক ব্রাহ্মণের আসন-সমীপে উপনীত হইয়া প্রণতি-পূর্ব্বক তাঁহাদের চরণরেণু গ্রহণ করিতেছেন; আর কুমার রামকৃষ্ণ, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া, একখানি স্বর্ণপাত্রে সেই চরণ-রেণু-সমূহ সংগ্রহ করিতেছেন। এইরূপে এক এক মণ্ডপের ব্রাহ্মণগণের পদধূলি-গ্রহণ-কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, আর তাঁহারা অন্য মণ্ডপে প্রবেশ করিতেছেন। রামনবমী হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় তিন মাসে মহারাণী লক্ষ-ব্রাহ্মণের পদধূলি সংগ্রহে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সেই তিন মাস কাল নাটোর-রাজধানীতে মহামহোৎসব চলিয়াছিল। সেই তিন মাস কাল যে ব্রাহ্মণ যে প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন, যে ব্রাহ্মণ যেরূপ ভক্ষ্য-ভোজ্যের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছিলেন,—রাজ-সংসার হইতে তাঁহাকে তাহাই প্রদান করা হইয়াছিল। সে কয়েক মাস কত ব্রাহ্মণের কত আব্দারই যে মহারাণীকে রক্ষা করিতে হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা হয় না। রামনবমী তিথিতে—যে দিন ব্রাহ্মণগণের পদধূলি-গ্রহণ আরম্ভ হয়, সেই দিন আহারে বসিয়া, দক্ষিণ-দেশীয় কয়েক জন ব্রাহ্মণ সদ্যঃ-চাক-ভাঙ্গা মধু খাইতে চাহেন। সদ্যঃ-চাক-ভাঙ্গা মধু—হঠাৎ তখন কি প্রকারে সংগ্রহ হওয়া সম্ভবপর! সে সময়ে এক তো মধুচক্র সংগ্রহ হওয়াই দুষ্কর; তাহার উপর আবার আহারে বসিয়া ব্রাহ্মণগণের মধু-পানেচ্ছা! কি করিয়া সে ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারে? দুই এক দিন পূর্ব্বে

সংবাদ পাইলে, রাজ-ভৃত্যগণ কোন-না-কোনও স্থান হইতে মধুচক্র সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারিত। কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে মধুচক্র এখন কোথায় মিলিবে?

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর যখন ব্রাহ্মণগণের মধুপানাকাঙ্ক্ষার সমাচার মহারাণীর নিকট জ্ঞাপন করিলেন, মহারাণী তখন বড়ই চিন্তান্বিতা হইলেন। সে অসময়ে সদ্যঃ-চাক-ভাঙ্গা মধু কোথায় পাওয়া যাইবে? মহারাণীর বড়ই ভয় হইল,—"তবে কি ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন করিতে না পারিয়া প্রত্যবায়ভাগী হইব? তবে কি আমার সকল কর্ম্ম পণ্ড হইবে?" মহারাণী এ বিষয়ে দয়ারাম রায়ের সহিত চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুরকে পরামর্শ করিতে কহিলেন; বলিলেন,—"যদি কোনও উপায় থাকে, আপনি তাহার ব্যবস্থা করুন। এ অবস্থায় যদি কেহ ঐরূপ মধু সংগ্রহ করিতে পারেন, আমি তাঁহাকে যথোচিত পুরস্কার দিব। আপনি সে পুরস্কারের বিষয় এখনই ঘোষণা করিয়া দেন।"

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুরকে প্রকাশ্যে এই কথা বলিয়া, মহারাণী ভবানী মনে মনে জগজ্জননীকে ডাকিলেন—"হে মা ভবানী! যেন আমার কর্ম্ম পণ্ড না হয়।"

এই সময় দয়ারাম রায় আসিয়া কহিলেন,—"মা! কোনও ভাবনা নাই। আপনার অভীষ্ট-সিদ্ধির পক্ষে কোনও বিঘ্ন ঘটিবে না। আমি ভাণ্ডারে সন্ধান করিতে গিয়া শুনিলাম, মধুর অভাব হইবে না। তাই তাড়াতাড়ি সংবাদ দিতে আসিয়াছি।"

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিরূপে কোথা হইতে মধু সংগ্রহ হইল?"

দয়ারাম। নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র একখানি নৌকা করিয়া অনেকগুলি মধুর চাক পাঠাইয়া দিয়াছেন। সেগুলি নৌকার মধ্যে ঝুলান আছে। মক্ষিকাগণ এখনও সে মধুচক্র পরিত্যাগ করে

নাই। নৌকা হইতে সেই মধু আনয়নের জন্য রামরূপকে পাঠাইয়াছি। এখনই মধু আসিয়া পৌঁছিবে।"

মহারাণীর আনন্দের আর অবধি রহিল না। তিনি মনে মনে মা-ভবানীর নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইলেন। এই মধু-সংগ্রহ উপলক্ষে দয়ারাম রায়ের উপর মহারাণী এতই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, এই সূত্রে তিনি দয়ারাম রায়কে লক্ষাধিক টাকা মূল্যের ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। সে সম্পত্তি আজি পর্য্যন্ত দয়ারাম রায়ের বংশধরগণ ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

অনতিবিলম্বে মধুচক্র লইয়া রামরূপ প্রত্যাবৃত্ত হইল। চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর উপস্থিত থাকিয়া ব্রাহ্মণগণকে পরিতোষ-পূর্ব্বক আহার করাইলেন। সেই সদ্য-চাক-ভাঙ্গা মধু প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণগণের আনন্দের পরিসীমা রহিল না। মহারাণী ভবানীর জয়-নিনাদে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—o—

অঙ্কুরোদ্গম।

কাম এব ক্রোধ এব রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপমা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥
ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্॥

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি-গ্রহণ-উৎসব শেষ হইলে, ব্রাহ্মণগণ একে একে বিদায়-গ্রহণ করিতে লাগিলেন। বিদায়ের ভার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের

কর্ম্মচারিগণের উপর ন্যস্ত ছিল। সুতরাং বিদায়-দান-ক্রিয়া অল্প দিন মধ্যেই সমাধা হইল। কোনও ব্রাহ্মণ কোনও বিষয়ে মহারাণী ভবানীর ব্যবস্থা-বন্দোবস্তের কোনরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখিতে পাইলেন না।

পদধূলি-গ্রহণোৎসব উপলক্ষে নাটোর রাজধানীতে গমন করিয়া, কুমার রামকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য, রাখাল প্রতিনিয়ত অবসর প্রতীক্ষা করিতেছিল।

কুমার রামকৃষ্ণ প্রত্যহ ব্রাহ্মণগণের পরিচর্য্যার জন্য তাঁহাদের নিকট পটমণ্ডপে আগমন করিতেন। কিন্তু সে সময় তাঁহার অগ্র-পশ্চাতে পারিষদগণ উপস্থিত থাকিত। পারিষদগণের সে বিষম ব্যূহ ভেদ করিয়া কুমারের সহিত সাক্ষাৎ করা বা কুমারকে কোনও কথা বলা—কাহারও পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। যাঁহারা ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর, তাঁহাদিগকে সম্মুখে পাইলেই যে সকল কথা বলিতে পারা যায় এবং তাঁহারাও সকল কথায় কর্ণপাত করেন, তাহা নহে। সুতরাং দুই তিন বার রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাইলেও, রাখাল আপন মনোভাব জ্ঞাপন করিবার অবসর পাইল না;—তাহার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। কুমার রামকৃষ্ণ যখন শেষদিন পটমণ্ডপ পরিদর্শন করিতে গমন করিলেন, সেদিনও রাখাল তাঁহাকে কোনও কথা বলিবার সুযোগ পাইল না।

একবার রাখাল কি-যেন-কি বলিবার জন্য উঠিয়াছিল। কিন্তু কুমারের পার্শ্বচরগণ তৎক্ষণাৎ তাহাকে হাত ধরিয়া বসাইয়া দেন। লক্ষ ব্রাহ্মণের মধ্যে—অসংখ্য বালক, যুবক, প্রৌঢ়ের মধ্যে—কুমার রামকৃষ্ণের দৃষ্টি রাখালের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তথাপি একবার তিনি যেন রাখালকে দেখিয়া তাহার সহিত কথা কহিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পার্শ্বচরগণ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সে স্থান হইতে সরাইয়া লইয়া যান।

পটমণ্ডপে কুমারের গমনাগমন-কালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকারের চেষ্টা যখন কোনক্রমেই ফলবতী হইল না; তখন রাখাল লোকদ্বারা কুমারের নিকট সংবাদ প্রেরণের চেষ্টা পাইল। কিন্তু কুমারের নিকট কে সে সংবাদ বহন করিয়া লইয়া যাইবে? সাহসে ভর করিয়া রাখাল একবার ঠাকুর মহাশয়দের একজনের নিকট আপনার মনোভাব ব্যক্ত করিল;—একবার কুমার রামকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাতের প্রার্থনা জানাইল। কিন্তু সেই ঠাকুর মহাশয় স্বয়ং রামকৃষ্ণের নিকট সে প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারিলেন না। তিনি অপর একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীকে তদ্বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। এইরূপে পর-পর কর্ম্মচারীদের নিকট সে সংবাদ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে সংবাদ কেহ শুনিলেন, কেহ বা শুনিলেন না। পরিশেষে সন্ধ্যার সময় উত্তর আসিল,—"কুমার বড়ই ব্যস্ত আছেন; কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিবার তাঁহার অবসর নাই।"

রাখাল এত করিয়াও কুমার রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাইল না। সে আপনাকে বড়ই অপমানিত মনে করিল। মনে মনে কহিল,— "এত অহঙ্কার! দেখিতে পাইয়াও কথা কহিল না। আমি এত করিয়া বলিয়া পাঠাইলাম, সে এত বড় হইল যে, একবার সাক্ষাৎ করিতে পারিল না! সে ঐশ্বর্য্যমদে এতই উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছে!"

রাখাল অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। মনে মনে কহিল.—"আচ্ছা, থাক রামকৃষ্ণ! তুমিই বা কেমন, আর আমিই বা কেমন, দেখা যাবে এক দিন। তোমার রাজ্য যদি ছারে-খারে দিতে পারি, তোমার এই ঐশ্বর্য্য-গর্ব্ব যদি চূর্ণ করিতে সমর্থ হই, তবেই আমার জীবন সার্থক বলিয়া মনে করিব।"

রাখাল সেই দিনই নাটোর রাজধানী পরিত্যাগ করিল। একান্ত-মনে রামকৃষ্ণের অনিষ্ট-সাধনে, তাঁহার ধনৈশ্বর্য্য অপহরণে, চেষ্টা পাইতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—o—

দান-গ্রহণ।

"ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ।"
—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

সকল ব্রাহ্মণ 'বিদায়' লইয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। কিন্তু একটী ব্রাহ্মণ 'বিদায়' গ্রহণ করিতে চাহিলেন না। চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর স্বয়ং তাঁহাকে 'বিদায়ের' অর্থ প্রদান করিতে যাইলে, ব্রাহ্মণ আপত্তি করিয়া কহিলেন,— "আমি বিদায় লইব কেন?"

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর ধীরভাবে উত্তর দিলেন,—"রাজপরিবারের কল্যাণের জন্য।"

ব্রাহ্মণ। রাজ-পরিবারের কল্যাণ-কামনা আমি কায়মনোবাক্যে করিতেছি। কিন্তু তাহার জন্য আমি অর্থ গ্রহণ করিব কেন?"

চন্দ্রনারায়ণ। দক্ষিণা ভিন্ন সঙ্কল্প সিদ্ধ হয় না। তাই আপনাকে অনুরোধ করিতেছি।

ব্রাহ্মণ। আপনি যেরূপ করিয়াই বুঝাইবার চেষ্টা পা'ন, আমি দান-গ্রহণ করিব না।

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর।—ব্রাহ্মণের গতি ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের দান-গ্রহণে ব্রাহ্মণের কি আপত্তি থাকিতে পারে? লক্ষাধিক ব্রাহ্মণের কেহই আপত্তি করিলেন না; সকলেই হাসিহাসি-মুখে বিদায়-গ্রহণ করিলেন; আপনিই বা কেন আপত্তি করিতেছেন? যদি এ দান আপনার মনঃপূত না হয়, বলুন—আমি মহারাণীকে সে বিষয় বরং জানাইতেছি।

ব্রাহ্মণ অট্টহাসি হাসিলেন। হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—"আপনি কি মনে করিতেছেন, আমি কিছু অধিক অর্থের প্রার্থী হইয়াছি? এ আপনার বড়ই ভ্রম দেখিতেছি। স্পষ্ট কথা শুনিবেন কি?—আশীর্ব্বাদ বিক্রয় করা আমার ব্যবসায় নয়।"

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার মুখের উপর এমন কথা বলিতে পারে,—বাঙ্গালায় কি তেমন ব্রাহ্মণ কেহ আছে? চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর, ক্ষণকাল নিরুত্তর থাকিয়া, ব্রাহ্মণকে কহিলেন,—"আপনার কথার উত্তর দেওয়া আমার সাধ্যাতীত। তবে মহারাণীর অভিপ্রায়—যদি কোনও বিষয়ে কোনরূপ বিঘ্ন ঘটে, মহারাণীকে তাহা জানাইতে হইবে। তাই আমার প্রার্থনা,—আপনি আমার সঙ্গে একবার আসুন, মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

ব্রাহ্মণ প্রথমে অস্বীকার করিলেন। বলিলেন,—"মহারাণীর সহিত সাক্ষাতের আমার কি প্রয়োজন? আমি তো মহারাণীর নিকট কোনরূপ অনুগ্রহ-প্রার্থী নই। তবে আমি কি জন্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব?"

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর। যে সদিচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া আপনি তাঁহাকে পদধূলি দান করিতে আসিয়াছেন, সেই সদিচ্ছা-প্রণোদিত হইয়াই আপনি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন,—এই আমার প্রার্থনা। আপনি দক্ষিণা না লউন, একবার মহারাণীর সমক্ষে আপনাকে উপস্থিত করিতে পারিলেই আমার কার্য্য সমাধা হয়।

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—"আপনার যখন এতই আগ্রহ, চলুন, আমি মহারাণীকে ও কুমার বাহাদুরকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসি। কিন্তু আমার প্রার্থনা,—আপনি আমায় দান-গ্রহণের জন্য কোনরূপ অনুরোধ করিবেন না।"

মহারাণী পূজার দালানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণগণের বিদায়-গ্রহণে কোনরূপ বিঘ্ন না ঘটে, সেখানে বসিয়া তাহারই তত্ত্ব লইতেছিলেন। কুমার রামকৃষ্ণ, তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া, আগন্তুকগণের অভিবাদন করিতেছিলেন।

ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর সেখানে উপনীত হইলে, মহারাণী স-সম্ভ্রমে উঠিয়া ব্রাহ্মণকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। কুমার রামকৃষ্ণও ব্রাহ্মণের চরণে প্রণত হইলেন। মহারণীর সম্মুখে ব্রাহ্মণের জন্য বসিবার আসন প্রদত্ত হইল। চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর সেই আসনে ব্রাহ্মণকে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলেন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—"না—আমি বসিব না। আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছি; আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া যাইব।"

ব্রাহ্মণ ফিরিয়া যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। মহারাণী সবিস্ময়ে ব্রাহ্মণের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—ব্রাহ্মণের শরীর হইতে কি যেন এক দিব্য-জ্যোতিঃ বিনির্গত হইতেছে।

ব্রাহ্মণ সত্যই তেজঃপুঞ্জকলেবর। বয়ঃক্রম সপ্ততি বর্ষ অতীত

হইয়াছে; কিন্তু তিনি এখনও যুবজনোচিত বল-সম্পন্ন। মস্তকের কেশরাশি শ্বেতবর্ণ ধারণ করিয়াছে; কিন্তু তাহাতে দেহের শোভা যেন অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে। বয়সে শরীরের লাবণ্য যেন নূতনভাবে বিকশিত হইয়াছে। তাঁহার আকর্ণবিস্তৃত নয়নযুগলের জ্যোতিঃ একটুও পরিম্লান হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। দীর্ঘদেহ, উন্নত ললাট, আজানুলম্বিত বাহু—সকল শুভলক্ষণই ব্রাহ্মণের দেহে বিদ্যমান। তাঁহার গৌর-দেহে শুভ্র উপবীতগুচ্ছ কি এক অপূর্ব্ব শ্রী সম্পাদন করিয়াছে! তাঁহার গাত্রাবরণ উত্তরীয় ভেদ করিয়া, তাঁহার দেহজ্যোতিঃ বিনির্গত হইতেছে।

আশীর্ব্বাদ করিয়াই ব্রাহ্মণ চলিয়া যাইতেছেন, চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুরের অনুরোধে কর্ণপাত করিতেছেন না; তদ্দৃষ্টে মহারাণী যুক্তকরে ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"ঠাকুর! যখন অনুগ্রহ করিয়া পদধূলি প্রদান করিয়াছেন, তখন দক্ষিণা-গ্রহণে কেন আপত্তি করিতেছেন?"

ব্রাহ্মণ বিনীত-স্বরে উত্তর দিলেন,—"মা! আমি যে দান গ্রহণ করিব না বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছি! আমার গুরুদেবের উপদেশ,—ব্রাহ্মণের কোনও বিষয়ে লোভ করিতে নাই। দান-গ্রহণে লোভের উৎপত্তি। আমি কিরূপে গুরুর উপদেশ অমান্য করিব?"

মহারাণী। তবে কি আমার শুভকার্য্য পণ্ড হইবে? আমি আপনার শরণাপন্ন।

ব্রাহ্মণ। মা! আপনি অমন কথা বলিতেছেন কেন? আমি তো প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছি। আপনার কাজ কেন পণ্ড হইবে?

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর শাস্ত্র-বাক্য উদ্ধার করিয়া, ব্রাহ্মণকে বুঝাইবার চেষ্টা পাইলেন,—'ব্রাহ্মণের দান-গ্রহণে ব্রাহ্মণের আপত্তির কোনও কারণ থাকিতে পারে না।'

ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন,—"আপনি যাহা বলিতেছেন, আমি সমস্তই বুঝিয়াছি। কিন্তু আমি তো পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—আশীর্ব্বাদ বিক্রয় করা আমার ব্যবসায় নয়। নিস্পৃহ নির্লোভ হওয়াই ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। একথা কি আপনি অস্বীকার করেন?"

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর পুনরায় শাস্ত্রবাক্য আবৃত্তি করিলেন; পুনরায় ব্রাহ্মণকে বুঝাইবার চেষ্টা পাইলেন। ব্রাহ্মণও উত্তর দিতে ক্রটী করিলেন না। ব্রাহ্মণ কহিলেন,—"লোভই নাশের কারণ। শাস্ত্রবাক্য-উদ্ধারে দেখাইলেন—'স তু নাশ কারণং। যথা—

লোভ-প্রমাদ-বিশ্বাসৈঃ পুরুষো নশ্যতি ত্রিভিঃ।
তস্মাল্লোভো ন কর্ত্তব্যঃ প্রমাদো নো ন বিশ্বসেৎ ॥"

আর বাদানুবাদ অনাবশ্যক। সুতরাং চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর কহিলেন,—"আপনি যাহা বলিতেছেন, আমি কদাচ তাহা অস্বীকার করি না। নিস্পৃহ নির্লোভ হওয়াই যে ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য, তাহাতে কি আর কোনও সংশয় আছে? তবে মহারাণীর কার্য্য যাহাতে পণ্ড না হয়, তাহাও তো আপনাকে দেখিতে হইবে।"

মহারাণীও বিনীত-স্বরে কহিলেন,—"আমার ব্রত যাহাতে উদ্‌যাপন হয়, আপনিই তাহার ব্যবস্থা করুন। আমার এইমাত্র প্রার্থনা।"

মহারাণীর বাক্যে বিচলিত হইয়া, বাষ্পাবরুদ্ধকণ্ঠে ব্রাহ্মণ কহিতে লাগিলেন,—"মা! সংসারের সহিত দারুণ সংগ্রাম করিয়াও সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিতেছি না। আবার কেন আমায় নূতন বন্ধনে আবদ্ধ করিতে চান! দান-গ্রহণ যে বিষম বন্ধন মা! পূর্ব্বজন্মের সহস্র বন্ধনের জ্বালায় জ্বলিয়া মরিতেছি; আবার ইহজন্মের নূতন বন্ধন সাধ করিয়া গলায় পরিব কেন—মা!"

"তবে উপায় কি হবে—বাবা!" এই বলিয়া মহারাণী ব্রাহ্মণের পদ-যুগল ধারণ করিলেন।

ব্রাহ্মণ একটু বিচলিত হইলেন; উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন,—"মা! তুই আজ আমার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করালি! তোর দান আমি গ্রহণ করিলাম; কিন্তু একটী কথা—"

ব্রাহ্মণ আবার কি কথা বলিবেন!—সকলেই উৎকণ্ঠিত হইয়া ব্রাহ্মণের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। মহারাণী ভবানী চাহিয়া রহিলেন; কুমার রামকৃষ্ণ চাহিয়া রহিলেন; চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর চাহিয়া রহিলেন।

ব্রাহ্মণ বলিতে লাগিলেন,—"একটী কথা—এই দান-প্রদত্ত সামগ্রী আমি কিছুই সঙ্গে লইব না। এ সমস্তই তোর জিম্মায় রহিল। ঐ দেখ মা!—দেশব্যাপী ঘোর অশান্তির অনল প্রজ্বলিত-প্রায়। সে অনলে পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ-তৃণ-গুল্ম-লতা পর্যান্ত ভস্মীভূত হইবে; আর তুই মা, তখন অন্নপূর্ণা-রূপে অন্ন-বিতরণ কর্‌বি। সেই সঙ্গে মা, আমার এই দান-প্রাপ্ত অর্থে যদি একজনেরও—একটী প্রাণীরও প্রাণ বাঁচাতে পারিস্, সেই চেষ্টা করিস্। সেই উদ্দেশ্যেই আমার এই অর্থ আমি তোর কাছে গচ্ছিত রেখে গেলাম।"

ব্রাহ্মণ এই বলিয়া দানদত্ত সামগ্রী স্পর্শ করিয়া মহারাণীর পার্শ্বে তাহা রাখিয়া দিলেন।

মহারাণী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। একবার বিনীত-স্বরে কহিলেন,—"আপনি যে বন্ধনের আশঙ্কায় আকুল হইয়াছেন, আমায় কি তবে সেই বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া যাইতে চাহেন?"

সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুরও কহিলেন,—"দান-দত্ত বিত্ত আপনার; পরবিত্ত-রক্ষাও কি বন্ধন নহে?"

মহারাণীও সেই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া কহিলেন,—"পরবিত্ত রক্ষাও

একপ্রকার বন্ধন। আপনি কেন আমায় সেই বন্ধনে আবদ্ধ করিতেছেন?"

ব্রাহ্মণ সে কথার কোনই উত্তর দিলেন না; বলিলেন,—"মা! তোর ভাবনা কি? তোর বন্ধন আপনিই মোচন হইবে।" এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে ব্রাহ্মণ প্রস্থান করিলেন।

কুমার রামকৃষ্ণের চিত্ত আবার এক নূতন ভাবনা-স্রোতে ভাসমান হইল। তিনি সন্ন্যাসীর নিকট শুনিয়াছিলেন—"মুক্তি দানই বন্ধন-মোচন।" ভবানী-মন্দিরের রাজপুরোহিতের নিকট শুনিয়াছিলেন,—'বলিদানে বন্ধন-মোচন।' আজ ব্রাহ্মণের নিকট শুনিলেন,—"দান-গ্রহণ না করাই বন্ধন-মোচন!" জননী আবার কহিলেন,—'পরবিত্ত-রক্ষায় বন্ধন।'

রামকৃষ্ণ ভাবিয়া কিছুই মীমাংসা করিতে পারিলেন না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

———o———

সমস্যা-নিরসনে!

"The cloud, which, intercepting the clear light,
Hangs o'er thy eyes, and blunts thy mortal sight,
I will remove."

—*Addison.*

বারি-বিন্দুর আশায় চাতক আকাশের পানে চাহিয়া আছে। 'ফটিক-জল'—'ফটিক-জল' করিয়া, পাখী পাগল হইয়া গেল।

সম্মুখে স্বচ্ছ সরোবর পড়িয়া আছে; পদপ্রান্তে নির্ম্মল বাহিনী তটিনী কুলুকুলু বহিতেছে; অদূরে অতল জলনিধি বিশাল বক্ষ বিস্তার করিয়া আছেন; ক্ষুদ্র পাখীর, এত জলেও তৃষ্ণা নিবারণ হয় না?

মানুষ! তোমারও সেই দশা! তুমি তো সংসার সাগরে পড়িয়া নিয়ত হাবুডুবু খাইতেছ! তোমারই বা তৃষ্ণা মিটিল কৈ? বিকারের রোগী!—যতই জলপান করিতেছ, তৃষ্ণা ততই বৃদ্ধি পাইতেছে না কি? আজি ধনতৃষ্ণা, কালি যশোলিপ্সা—তোমার পিপাসা কবে মিটিবে?

একবার চাতক হইয়া চাহিতে পার? বারি-বিন্দুর আশায় একবার আকাশের পানে চাহিয়া ডাকিতে পার? পঞ্চমবর্ষীয় শিশু, আকাশের পানে চাহিয়া ডাকিয়াছিল—'কোথা ভগবান করুণানিধান।' তার তো পিপাসা মিটিয়াছিল! আহা!—বারিবিন্দু নয়—সে যে অমৃতবিন্দু! বিকারের রোগীর তাহাই উপযোগী। রোগের যাতনায়, দারুণ পিপাসায় নিশিদিন ছট্‌ফট্ করিতেছ! প্রাণ!—একবার চাতক হইতে পারিবে না!

কুমার রামকৃষ্ণ তো চাতক হইতে পারিলেন না! তবে তাঁহার পিপাসার কি প্রকারে নিবৃত্তি হইবে? তাঁহার চিত্ত—শত-চিন্তায় শত-সংশয়-প্রবাহে আন্দোলিত! কি করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন?

দারুণ সংশয়! এ সংশয় কে দূর করিবে? রামকৃষ্ণ কখনও মনে করেন,—"সুখ কি? সুখ কোথায় পাই? ঐশ্বর্য্যই কি সুখের নিদান? যদি তাহাই হয়, তবে ব্রাহ্মণ কেন ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া গেলেন? মা কেন ঐশ্বর্য্যে বন্ধন-ভয় পাইলেন? তবে কি ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগই সুখের নিদান?"

পরক্ষণেই আবার তাঁহার মনে হয়,—"না—না! তাহাই বা কেমন করিয়া হইতে পারে! আমার পিতা ঐশ্বর্য্যরূপ সুখের জন্য আমাকে রাজ-পরিবারে রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—'এ ঐশ্বর্য্য-লাভে

তাঁহারও সুখ-শান্তির সম্ভাবনা, আমারও সুখ-শান্তির সম্ভাবনা।' আমার প্রভুদেব কখনও অসঙ্গত কথা কহিতে পারেন না। বিশেষতঃ যখন দেখিতে পাই,—যাহাদের ঐশ্বর্য্য নাই তাহারা সুখী নহে, ঐশ্বর্য্যের জন্য সহস্র সহস্র ব্যক্তি নিত্য নিত্য আমাদের দুয়ারে ভিক্ষাপ্রার্থী হইয়া আসিতেছে; তখন কেমন করিয়া বলিতে পারি,—ঐশ্বর্য্যে সুখ নাই! লক্ষ ব্রাহ্মণের মধ্যে এক জন ব্রাহ্মণ অর্থের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন বটে; কিন্তু আর তো কৈ কেহ পারিলেন না? তবে কি করিয়া বলিব,—ঐশ্বর্য্য সুখের মূলীভূত নহে! কেমন করিয়াই বা না বলিব,—ঐশ্বর্য্যই সুখের মূলীভূত!"

যখন সেই সন্ন্যাসীর কথা মনে হয়, রামকৃষ্ণ তখন ভাবেন—"সন্ন্যাসীই বা তবে কি বলিলেন! যদি বন্ধন-মোচনই সুখ হয়, আমি কি রাজভবনের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া অন্যত্র যাইতে পারিলেই সুখী হইব? কিন্তু তাহাও তো আমার মনে হয় না! এমন বসন-ভূষণ, এমন আহার-বিহার —আমি কোথায় পাইব? এখানে আমার যে সম্মান, আমার পিত্রালয়ে তো সে সম্মান কখনও দেখি নাই! এই রাজৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া ভিখারীর বেশে পথে বাহির হইলেই যে আমি সুখী হইতে পারিব, ভ্রমেও তো আমার মনে হয় না! তবে সন্ন্যাসী আমায় সে কি বুঝাইলেন?"

পরক্ষণেই আবার মনে হয়,—"তবে কি রাজপুরোহিতের কথাই সত্য! বলিদানে পশুর মুক্তিলাভ হইল কি না,—যদিও তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু বলি-প্রদত্ত প্রসাদ-ভক্ষণে আমাদের রসনার পরিতৃপ্তি নিশ্চয়ই হইয়া থাকে। সে সুখী হইল কি না,—সে সন্ধানে আমার প্রয়োজন কি? আমি তো সুখী হই। তবে কি রাজপুরোহিতের কথাই সত্য! তবে কি পরপীড়ন—পরপ্রাণ-হরণই সুখের নিদান?" রামকৃষ্ণ স্থির করিলেন,—পরপীড়নই সুখের আকর।

পরক্ষণেই পুনরায় চিন্তার গতি পরিবর্ত্তিত হইল। "পরপীড়নে সুখ!—তাই বা কি করিয়া বলিতে পারি! বলিতেছি বটে,—বলি-প্রদত্ত ছাগ-মাংসে পরিতৃপ্তি-সুখ পাইয়াছি। কিন্তু সে সুখ কত অল্প—কত ক্ষণস্থায়ী! মায়ের মন্দিরে দাঁড়াইয়া যখন সেই বলির ছাগশিশুগণের আর্ত্তনাদ শুনিয়াছিলাম, তখন প্রাণটা কেমন কাঁদিয়া উঠিয়াছিল! এখনও সে স্মৃতি মনোমধ্যে উদয় হইলে, প্রাণ বিদীর্ণ হয়। তবে কেমন করিয়া বলি,—পরপীড়নই মুক্তি—পরপীড়নই সুখের আকর! বলিদান—পরপীড়ন ভিন্ন আর কি হইতে পারে!"

রামকৃষ্ণের চিন্তার গতি সহস্র ধারায় প্রবাহিত। সহস্রমুখী চিন্তার প্রবাহে কুমার রামকৃষ্ণ সহস্ররূপে বিচালিত হইতেছেন।

প্রাসাদের চতুষ্পার্শ্বে বিস্তৃত পরিখা। সে পরিখা দেখিলে মনে হয়—একটী স্রোতস্বিনী যেন রাজপুরী পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। সেই পরিখার তীরে, একটী আম্রবৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া, কুমার রামকৃষ্ণ ভাবনায় বিভোর হইয়া পড়িয়াছেন। অপরাহ্নে—কত বেলা থাকিতে,—কুমার সেই বৃক্ষমূলে আসিয়া বসিয়াছেন। এখন সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়; তথাপি তিনি সে স্থান পরিত্যাগ করেন নাই। এখন, সান্ধ্য-সমীর-প্রবাহে পরিখার জলরাশি যেমন বিচঞ্চল হইতেছিল, বীচি-বিক্ষোভিত ও পরিকম্পিত হইতেছিল, চিন্তার প্রবাহে কুমারের চিত্তও সেইরূপ বিচঞ্চল ও বিক্ষোভিত করিয়া তুলিয়াছিল।

কোনদিকে দৃক্‌পাত নাই। পরিখার জলরাশি মৃদুল হিল্লোলে কিরূপ নৃত্য করিতেছে, অথবা সুনির্ম্মল সান্ধ্য-গগন-প্রান্তে সূর্য্যদেব কিরূপভাবে লুক্কায়িত হইতেছেন,—প্রকৃতির সে সৌন্দর্য্যের প্রতি কুমার রামকৃষ্ণ একবারও দৃক্‌পাত করিতেছিলেন না। ভাবনার প্রবাহে ভাসমান হইয়া, তিনি আপনাতেই আপনি বিভোর হইয়াছিলেন। মুখে প্রায়ই বাক্যস্ফূর্ত্তি

হইতেছিল না। তবে মাঝে মাঝে এক একবার আপন মনে আপনি বলিতেছিলেন,—"দারুণ সংশয়! আমার এ সংশয়ের কি মীমাংসা হইবে না!"

মহারাণী ভবানী, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কুমারকে না দেখিয়া প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে তাঁহার সন্ধান করিতেছিলেন। সন্ধান করিতে করিতে ছাদের উপর উঠিয়া মহারাণী হঠাৎ দেখিতে পাইলেন,—অন্দর-সমীপস্থ পরিখার পার্শ্বে আম্রবৃক্ষ-মূলে কুমার বসিয়া আছেন। দেখিয়া, ছাদ হইতে নামিয়া, মহারাণী আপনিই কুমারকে ডাকিয়া আনিবার জন্য গমন করিলেন।

মহারাণী ধীরে ধীরে কুমারের নিকট উপস্থিত হইলেন। কুমার তখন তন্ময় হইয়া বসিয়া আছেন। তিনি একমনে একই ভাবনায় বিভোর। সুতরাং মহারাণীর আগমনের বিষয় কিছুই জানিতে পারিলেন না। মহারাণীও, কুমারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, অনেকক্ষণ এক-দৃষ্টে কুমারের প্রতি চাহিয়া রহিলেন,—কুমারের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

ভাবিয়া ভাবিয়া কুমার কোনই মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিলেন না। যখন কোনও মীমাংসা হইল না, কুমার আবেগভরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"তবে কি মীমাংসা হইবে না!"

সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্ব হইতে প্রতিধ্বনি উঠিল,—"মীমাংসা অবশ্যই হইবে। তুমি এস—আমার সঙ্গে এস।"

স্বর শুনিয়া কুমারের মনে হইল,—তিনি যেন দৈববাণী শুনিলেন। কুমার চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে মহারাণী ভবানী দণ্ডায়মানা। দেখিয়াই "মা" বলিয়া কুমার সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মহারাণী কহিলেন,—"বৃথা ভাবনায় আবশ্যক নাই। এ সংশয়ের মীমাংসা শীঘ্রই হইবে।" এই বলিয়া, কুমারের হস্তধারণ-পূর্ব্বক, মহারাণী প্রাসাদ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

——০——

বন্ধন-চেষ্টা।

"বাঁধাব চুলের রাশ, পরাব চিকণ বাস,
খোপায় দোলাব তোর ফুল।
কপালে সিঁথির ধার, কাঁকলেতে চন্দ্রহার,
কাণে তোর দিব যোড়া দুল॥
কুঙ্কুম চন্দন চুয়া, বাটা ভরে পান গুয়া,
রাঙ্গা মুখ রাঙ্গা হবে রাগে।
সোণার পুতলি ছেলে, কোলে তোর দিব ফেলে,
দেখি ভাল লাগে কি না লাগে॥"

——কপালকুণ্ডলা।

সংসারের বিচিত্র গতি! সংসারে কেহ বন্ধন-মুক্ত হইতে চায়; কেহ তাহাকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করে।

কুমার রামকৃষ্ণ যতই সংসার হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন; সংসার ততই তাঁহাকে আবদ্ধ করিবার জন্য ব্যগ্র হইল।

ভবানী-মন্দিরে উৎসব-সমারোহের পর, মহারাণী ভবানী যেদিন কুমারকে অন্যমনা দেখিয়াছিলেন,—কুমারের মুখে সংসার-বন্ধন-মোচন-সম্বন্ধে প্রশ্ন-পরম্পরা শুনিয়াছিলেন; সেই দিন হইতেই কুমারের মতি-পরিবর্ত্তনের প্রতি তাঁহার লক্ষ্য হইয়াছিল। আজ আবার যখন তিনি পরিখার পার্শ্বে বসিয়া কুমারকে চিন্তা-বিভোর দেখিলেন, আজ আবার

যখন কুমারের মুখে সেই একই প্রসঙ্গ শ্রবণ করিলেন; তখন মহারাণী অধিকতর চিন্তান্বিতা হইলেন। মহারাণী মনে করিয়াছিলেন,—পোষ্য-পুত্র গ্রহণ করিয়া, তাহার হস্তে রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক, আপন সংসার বন্ধন ছিন্ন করিবেন। কিন্তু এ আবার কি ঘটিল! আশা-তরু মুঞ্জরিত মুকুলিত হইবার পূর্ব্বেই কেন সে তরুমূলে কীট প্রবেশ করিল!

মহারাণী ভাবিতে লাগিলেন,—"কি করিলে কুমার সংসারী হয়? কুমার যদি সংসারে অনাসক্ত সংসার-বিরাগী হয়, এ বিপুল রাজ্য কিরূপে রক্ষা হইতে পারে? আমার যে অবস্থা তাহাতে আমার এখন সংসার-চিন্তা হইতে অবসর গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ। এখনও এ সকল ভাবনা ভাবিতে গেলে, ইষ্টচিন্তা কবে করিব?"

ভাবিয়া ভাবিয়া মহারাণীর মনে হইল,—'অধিক কালবিলম্ব করিলে হয় তো কুমারকে প্রত্যাবৃত্ত করা কঠিন হইবে।' সুতরাং স্থির করিলেন, 'একবার দয়ারাম রায়কে এবং চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুরকে ডাকাইয়া পরামর্শ করা বিধেয়।'

পরদিনই সেই সম্বন্ধে পরামর্শ হইল। দয়ারাম রায়, এবং চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর উপস্থিত হইলে, চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুরের নিকট মহারাণী সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। দয়ারাম রায় ও চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর তদ্বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর কহিলেন,—"শাস্ত্রজ্ঞানানভিজ্ঞ চঞ্চলচিত্তই এবম্বিধ প্রশ্নে উদ্বেলিত হইয়া থাকে। গুরুর নিকট যথারীতি শাস্ত্রতত্ত্ব অবগত হইলে সংশয় দূর হইতে পারে।"

দয়ারাম রায়। একথা সত্য বলিয়াছেন। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে মানুষ জীবনগতি নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় না। তবে এ বয়সে সেরূপ

শিক্ষা উপযোগী হইবে কিনা, তাহাও বিবেচনার বিষয়। মস্তিষ্ক পরিপক্ক না হইলে, শাস্ত্র-তত্ত্ব অনুধাবন সম্ভবপর কি?

চন্দ্রনারায়ণ। সদ্‌গুরুর উপদেশে মন অনেকটা স্থৈর্য্য অবলম্বন করিতে পারে। আমার মনে হয়, কুমার যদি এখন দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং গুরুর নিকট যথোপযুক্ত শাস্ত্রোপদেশ প্রাপ্ত হন, কুমারের মতি পরিবর্ত্তিত হওয়া সম্ভবপর।

দয়ারাম রায়। সেও এক সদুপায় বটে। তবে সঙ্গে সঙ্গে সংসারের প্রতি কুমারের মন যাহাতে আকৃষ্ট হয়, তৎপক্ষেও যত্ন করা কর্ত্তব্য। গুরূপদেশে চিত্ত সাধারণতঃ ভগবচ্চিন্তায় প্রধাবিত হয়। তাহাতে সংসারাসক্তি নাও আসিতে পারে।

চন্দ্রনারায়ণ। আপনি তাহা হইলে কিরূপ যুক্তি স্থির করেন?

দয়ারাম রায়। কুমার দীক্ষিত হইয়া গুরুর নিকট শাস্ত্রতত্ত্ব শিক্ষা করুন,—সে পক্ষে আমার সম্পূর্ণ মত আছে। তবে কুমারকে সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ করিতে হইলে, আমার মনে হয়, আর একটী ব্যবস্থার প্রয়োজন। আমি বিবেচনা করি,—বিবাহবন্ধনে কুমারকে এই সময়ে আবদ্ধ করিতে পারিলে, আমাদের সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। কুমার একদিকে যেমন গুরুর নিকট সুশিক্ষা লাভ করিবেন, অন্যদিকে তেমনি বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সংসারের প্রতি আকৃষ্ট হইবেন। এ ব্যবস্থায় দুই দিকই রক্ষা হইবে। কেমন—এ বিষয়ে আপনি কি মনে করেন?

চন্দ্রনারায়ণ। আপনার এ পরামর্শ সমীচীন বটে। কুমারের বিবাহ দেওয়া আমারও মত। বিবাহ হইলে, কুমারের চিত্ত নিশ্চয় সংসারের প্রতি আকৃষ্ট হইবে। দীক্ষিত হইলেও গুরূপদেশে কুমারের মনের মালিন্য দূরীভূত হইবে।

দয়ারাম রায়। গুরুগ্রহণ-সম্বন্ধেও আমার একটু বক্তব্য আছে। আপনারা তো এ সংসারের গুরুপদে অধিষ্ঠিত আছেনই; অধিকন্তু আমার ইচ্ছা—কুমার মহারাণীর নিকট হইতে ইষ্টমন্ত্র গ্রহণ করেন। তাহাতে মহারাণীর প্রতি কুমারের ভক্তি বৃদ্ধি পাইবে এবং মহারাণীর আদেশানুবর্ত্তী হইয়া চলিতে কুমার অবশ্যই চেষ্টা পাইবেন। আপনারা গুরুর-গুরুরূপে কুমারকে উপদেশ দিবেন; কুমার ভক্তিসহকারে আপনাদের উপদেশ গ্রহণ করিয়া অনায়াসে গন্তব্য পথ স্থির করিয়া লইতে পারিবেন।

চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া কহিলেন,—"আপনি যথার্থ কথাই কহিয়াছেন; আমারও সেই ইচ্ছা। এরূপ হইলে, কুমারের মাতৃভক্তি বৃদ্ধি পাইবে; কুমার মাতার আদেশ অনুসারে কার্য্য করিবে। এ প্রস্তাব আমি সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করি।"

মহারাণী ভবানী একটু দ্বিধা ভাব প্রকাশ করিলেন। কিন্তু চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন,—"এ সম্বন্ধে অন্যমত করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। মাতৃদেবীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিলে ঠাকুরবংশীয় আমরা একটুও ক্ষুণ্ণ হইব না। রাজৈশ্বর্য্য যাহাতে রক্ষা হয়, তাহার সুব্যবস্থা করাই আমাদের অভিপ্রায়। কুমার যদি মহারাণীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন, মহারাণীর আদেশানুবর্ত্তী হইয়া চলেন, আমার বিশ্বাস সকল দিকেই সুশৃঙ্খলা রক্ষিত হইবে।"

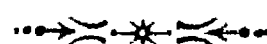
চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর মহারাণী ভবানীকে ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইতে একান্তভাবে অনুরোধ করিলেন। মহারাণী চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুরের বাক্য লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না।

পরামর্শে ধার্য্য হইল,—'শীঘ্রই কুমার রামকৃষ্ণের বিবাহের বন্দোবস্ত স্থির হইবে।' পরামর্শে ধার্য্য হইল,—'মহারাণী ভবানীর নিকট কুমার

রামকৃষ্ণ দীক্ষা গ্রহণ করিবেন।' পরামর্শে স্থির হইল,—'গুরুর-গুরুরূপে চন্দ্রনারায়ণ ঠাকুর এবং তাঁহার পুত্র রুদ্রনারায়ণ ঠাকুর কুমারের সুশিক্ষার সুব্যবস্থা করিবেন।' পরামর্শে স্থির হইল,—'কুমার যাহাতে আর নির্জ্জন-চিন্তায় কালাতিপাত করিতে না পারেন, সর্ব্বদা তিনি যাহাতে উপযুক্ত সহচরগণে পরিবৃত থাকেন,—তাহারও ব্যবস্থা করা আবশ্যক।" পরামর্শে স্থির হইল,—'তাহা হইলেই কুমারের সকল দুশ্চিন্তা দূর হইবে,—কুমার সংসারী হইবেন।' যেরূপ পরামর্শ হইল, তদ্রূপ অনুষ্ঠান-আয়োজনেরও ক্রটি রহিল না।

ইতি দ্বিতীয় খণ্ড

মণিবেগম।



তৃতীয় খণ্ড।



"যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমশক্তঃ স বিশিষ্যতে॥"

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা॥

হে অর্জ্জুন! যে পুরুষ মনের বলে ইন্দ্রিয়নিচয়কে বশীভূত করিয়া আসক্তি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিষ্কামভাবে কর্ম্মেন্দ্রিয়-সমূহের দ্বারা কর্ম্মরূপ যোগানুষ্ঠান করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ।



প্রথম পরিচ্ছেদ।

—o—

অনুশোচনা।

"Ingratitude! Thou marble-hearted fiend!—"

—*Shakespeare.*

"নৃশংস!—নরপিশাচ!—বিশ্বাসঘাতক!"

এই বলিয়া মীরজাফর শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার চক্ষু বিদীর্ণ করিয়া যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন,—"মহারাজ! এখনও আপনার ভ্রান্তি দূর হইল না!"

পলাশী-যুদ্ধের পর সাত বৎসর অতীত-প্রায়। বক্সারের সমর-ক্ষেত্রে মীরকাশেমের ক্ষীণ আশার রশ্মিটুকু বিলুপ্ত হওয়ায়, নবাব মীরজাফর পুনরায় বাঙ্গালার মসনদে সমাসীন। কিন্তু ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা টাকার জন্য এবারও তাঁহাকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। সুতরাং বাঙ্গালার নবাবী তাঁহার পক্ষে এখন কণ্টক-স্বরূপ। দুর্ভাবনায়—দুশ্চিন্তায়—অনুশোচনার তীব্রতাপে—তিনি এখন কঠিন পীড়ায় শয্যাশায়ী।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে, মীরজাফর যখন সঙ্কট পীড়ায় কাতর;—আপনার দক্ষিণহস্ত-স্থানীয় মহারাজ নন্দকুমারকে নিকটে ডাকিয়া, বিষয়কর্ম্ম-সম্পর্কে পরামর্শ করিতেছেন। যতই পুরাতন কাহিনী স্মৃতি-পথে উদিত হইতেছে, ততই তিনি উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছেন।

সেই উত্তেজনা-বশেই, শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া, মীরজাফর চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"নৃশংস!—নরপিশাচ!—বিশ্বাসঘাতক!"

মহারাজ নন্দকুমার ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন,—"আপনি বৃথা অনুশোচনা করিতেছেন। গতানুশোচনায় এ সময় চঞ্চলচিত্ত হওয়া কখনই বিধেয় নহে। আমরা আপন আপন কর্ম্মফল ভোগ করিতেছি মাত্র। অপরের প্রতি দোষারোপ করিয়া কি ফললাভ হইবে? দোষ আমাদের অদৃষ্টের!"

মীরজাফর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"আমি যে তাহাকে বড়ই বিশ্বাস করিয়াছিলাম! সে যে এতদূর বিশ্বাসঘাতকতা করিবে, আমি স্বপ্নেও তাহা ভাবি নাই! এরূপ ঘটিবে বুঝিলে, আমি কি কখনও সিরাজ-উদ্দৌলার সর্ব্বনাশ-সাধনে অগ্রসর হইতাম?"

নন্দকুমার আবার কহিলেন,—"সে সকল পুরাতন কথা এখন আর কেন মনে করেন? যাহা হইবার, হইয়া গিয়াছে। এখন দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করুন। শরীর যাহাতে সুস্থ হয়, তৎপক্ষে মনোযোগী হউন।"

মীরজাফর বাষ্পাবরুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন,—"মহারাজ! বড় কষ্ট—বড় যন্ত্রণা! আমার আর এক দণ্ড বাঁচিবার সাধ নাই! সিরাজ যখন আমার চরণতলে উষ্ণীষ রাখিয়া আত্মসমর্পণ করিল, আমি যখন তাহাকে অভয় দিয়া বলিলাম,—'সিরাজ! তোমার কোনও ভাবনা নাই'; পরিশেষে আবার যখন কোরাণ স্পর্শ করিয়া, ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া, পরস্পর মিত্রতা-বন্ধনে আবদ্ধ হইবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিলাম; তখনকার কথা স্মরণ হইলে, প্রাণ বিদীর্ণ হয়! আহা!—সিরাজ আমার প্রতি সম্পূর্ণ-রূপ বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল! কিন্তু সে বিশ্বাসের আমি কি প্রতিদান করিলাম!"

মীরজাফরের অনেক ক্ষণ বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। চক্ষু বাহিয়া কয়েক

বিন্দু অশ্রু নিপতিত হইল। নন্দকুমার সান্ত্বনা-বাক্যে কহিলেন,—"যে উদ্দেশ্যে আপনি সিরাজের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে আমি কোনও দোষ দেখিতে পাই না। সিরাজ অত্যাচারী—সিরাজ নৃশংস—সিরাজ সিংহাসনে বসিবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। সেরূপ প্রকৃতির লোক বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিলে, বাঙ্গালা এতদিন ছারে-খারে যাইত।"

মীরজাফর। বাঙ্গালা ছারে-খারে যাইতে কি আর বাকী আছে মহারাজ! সিরাজ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে, হয় তো বাঙ্গালার আজ এ দুর্দ্দশা হইত না! এখন ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর কয়েক জন কর্ম্মচারী বাঙ্গালার প্রতি কি অত্যাচার করিতেছে, আপনার কি তাহা অবিদিত আছে? তবে আপনি ওকথা কেন বলিতেছেন?"

নন্দকুমার। বর্ত্তমানে কয়েক জন কর্ম্মচারী ঘোর অত্যাচারী হইয়াছেন সত্য; কিন্তু এ অত্যাচার শীঘ্রই নিবৃত্ত হইবে। আপনার দেহ অসুস্থ; এ সময় আপনি যদি ঐরূপ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হন, শরীর কয় দিন টিকিবে? আপনার শরীর সুস্থ হউক; আপনার প্রতাপ যাহাতে অপ্রতিহত থাকে, তৎপক্ষে বিশেষ চেষ্টা করা যাইবে।

মীরজাফর। আর সে চেষ্টা! দিন যে ফুরাইয়া আসিল!—আর সে চেষ্টা! সে চেষ্টা আগে করিলে হইত বটে; কিন্তু এখন আর সময় নাই! ক্লাইবের বাক্যমোহে যদি মুগ্ধ না হইতাম, প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ-রূপ মহা-পাপে যদি লিপ্ত না হইতাম, পলাসী-প্রাঙ্গণে সিরাজের সহিত যদি বিশ্বাসঘাতকতা না করিতাম, হয় তো ফল ফলিতে পারিত! তাহা হইলে, এখন আমি নবাবীর যে লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছি, সে লাঞ্ছনা হয় তো আমায় কখনও ভোগ করিতে হইত না। তাহা হইলে, সিরাজ নামে মাত্র নবাব থাকিলেও, আমিই বাঙ্গালার নবাবী-ক্ষমতা পরিচালনা করিতে পারিতাম। কিন্তু হায়!—আমি তখন লোভে পড়িয়া কি ভুলই করিয়াছিলাম!"

মীরজাফর পুনরায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। কত কথাই তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। মনে পড়িতে লাগিল।—নবাবীর মোহমায়া! মনে পড়িতে লাগিল—প্রলোভনের মায়া-মরীচিকা! মনে পড়িতে লাগিল—আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার আশা! মনে পড়িতে লাগিল,—কোরাণ-স্পর্শে প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের কথা! আর মনে পড়িতে লাগিল—ইহজীবনেই পাপের ফল-ভোগ। মনে পড়িতে পড়িতেই মীরজাফর আবেগভরে বলিয়া উঠিলেন,—"সেই আমার সর্ব্বনাশের মূল! তাহারই লুব্ধ আশ্বাসে মুগ্ধ হইয়া আমি সব বিস্মৃত হইলাম! সিরাজের মুখ চাহিলাম না! দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম না! স্বজাতির প্রতি চাহিয়া দেখিলাম না! প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গে কুণ্ঠিত হইলাম না! ব্যাধের বংশীধ্বনিতে মুগ্ধ হইয়া মৃগ যেমন জালবদ্ধ হয়, ক্লাইবের ছলনা জালে আমিও তদ্রূপ আবদ্ধ হইলাম! তখন স্বপ্নেও যদি একবার মনে হইত—আমার এই পরিণাম সংঘটিত হইবে!"

মহারাজ নন্দকুমার ক্লাইবের প্রতি পূর্ব্ব হইতেই অনুরক্ত ছিলেন। সুতরাং মীরজাফর কর্তৃক পুনঃপুনঃ ক্লাইবের উদ্দেশ্যে গালিবর্ষণে তিনি একটু বিচলিত হইলেন। তিনি মীরজাফরের কথার প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন,—"আপনি পুনঃপুনঃ বলিতেছেন বটে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি ক্লাইবের কোনও দোষ দেখিতে পাই না। আপনার সম্বন্ধে ক্লাইব যাহা বলিয়াছিলেন, সে কথা কি তিনি রক্ষা করেন নাই? তিনি বলিয়াছিলেন—সিরাজের হস্ত হইতে সিংহাসন গ্রহণ করিয়া সে সিংহাসন তিনি আপনাকেই সমর্পণ করিবেন। সে সত্য তিনি পালন করেন নাই কি? তবে ক্লাইবের কি দোষ?"

মীরজাফর গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—"ক্লাইবের কি দোষ! আপনি কি জানেন না—ক্লাইবের কি দোষ! নিরীহ উমীচাঁদ ক্লাইবের প্ররোচনায়

কি অসম-সাহসিক কাজই না করিয়াছিল! কিন্তু তাহার শেষ পরিণাম কি হইল? ক্লাইব জাল দলিল উপস্থিত করিয়া তাহাকে প্রবঞ্চিত করিলেন! আর সেই প্রবঞ্চনার ফলে উমীচাঁদ পাগল হইয়া ইহলীলা সংবরণ করিল।"

নন্দকুমার। উমীচাঁদের পক্ষাবলম্বন আপনার শোভা পায় না। উমীচাঁদ যে কার্য্য করিয়াছিল, তাহার পরিণাম ঐরূপ হওয়াই বিধেয়। আমি যখন হুগলীর ফৌজদার, উমীচাঁদই আমায় নবাবের বিরুদ্ধাচরণে প্রলুব্ধ করিয়াছিল। আমি যে ইংরাজগণকে বিতাড়িত করিবার জন্য ওলন্দাজদিগের সহিত সমরক্ষেত্রে মিলিত হই নাই, সে কেবল উমীচাঁদেরই প্ররোচনায়। উমীচাঁদ স্বদেশদ্রোহী। তাহার স্বদেশদ্রোহিতার পরিণাম-ফল ঠিকই হইয়াছে।"

মীরজাফর মনে মনে হাসিলেন; মনে মনে বলিলেন,—"যদি তাই হয় নন্দকুমার, তোমার আমার অদৃষ্টে কি ফল লিখিত আছে, কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছ কি?" প্রকাশ্যে কহিলেন,—"যতই যাহা বলুন, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ অনেকেই ঘোর স্বার্থপর। তাঁহাদের চাই,—কেবল টাকা—কেবল টাকা!"

নন্দকুমার। তাহাই স্বাভাবিক। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী এদেশে কিছু দান-খয়রাৎ-সদাব্রত করিতে আসেন নাই। তাঁহারা বাণিজ্য-ব্যবসায়ী। সাত-সমুদ্র তের-নদী পার হইয়া অর্থের জন্যই তাঁহারা এই দূরদেশে আগমন করিয়াছেন। সুতরাং অর্থসংগ্রহ-পক্ষে তাঁহাদের যে চেষ্টা, আমি তাহাতে দোষ দেখিতে পাই না। তাহাই স্বাভাবিক!"

মীরজাফর আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; কহিলেন,—"আপনি যে এখনও ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের প্রতি এতাদৃশ বিশ্বাসবান্, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়! আপনি কি জানেন না,—ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর

অধ্যক্ষ ভ্যান্সিটার্ট আপনার প্রতি কিরূপ বিরূপ হইয়া আছেন? আমি কত করিয়া আপনাকে সহকারী নবাবের পদে অধিষ্ঠিত রাখিয়াছি, তাহা আমিই জানি, আর অন্তর্যামীই জানেন। ভ্যান্সিটার্টের একটুও ইচ্ছা নয় যে, নবাব-সংসারের সহিত আপনার কোনরূপ সম্বন্ধ থাকে। আমি যে আজ আপনাকে ডাকিয়া আনিয়াছি, অনেক পরামর্শের জন্য। আমি বেশ বুঝিয়াছি, আমার আয়ুঃকাল পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। বাঙ্গালার মসনদ-সম্পর্কে আপনার সহিত আমি একটা পরামর্শ করিতে ইচ্ছা করি। পরামর্শ আর কিছু নয়; পরামর্শ—আমার মৃত্যুর পর আমার কনিষ্ঠ পুত্র মোবারককে সিংহাসনে বসাইতে হইবে। কিন্তু ভ্যান্সিটার্ট তখনও যে আপনাকে এ সংসারে কর্তৃত্ব করিতে দিবেন, তাহা আমার মনে হয় না।"

নন্দকুমার আশ্বাস-বাক্যে কহিলেন,—"সে সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত হউন। আমি নিগূঢ় সন্ধান পাইয়াছি, ভ্যান্সিটার্ট শীঘ্রই দেশে ফিরিয়া যাইতেছেন; আর ক্লাইব পুনরায় ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর অধ্যক্ষ-পদ গ্রহণ করিতে আসিতেছেন। ক্লাইব আসিলে, আপনি নিশ্চয় জানিবেন, আমার ক্ষমতা কেহই লোপ করিতে পারিবে না। নবাব-সংসারের সংস্রব ছিন্ন হইলে, তিনিই আমাকে প্রথম আশ্রয় দিয়াছিলেন। তাঁহার মুন্সী ও দেওয়ান পদ লাভ করিয়া, তাঁহারই অনুগ্রহে, ক্রমশঃ আমি হুগলী ও হিজ্‌লী প্রভৃতির দেওয়ানী পদ পাই। তার পর, কিরূপে এই সহকারী নবাবের পদে উন্নীত হইয়াছি, তাহা আপনার অবিদিত নাই। ক্লাইব যখন আসিতেছেন, আমার উদ্দেশ্য অবশ্য সিদ্ধ হইবে।"

মীরজাফর। আবার ক্লাইব! সে একবার আসিয়া বাঙ্গালার সিংহাসন ওলোট-পালোট করিয়া গিয়াছে। এবার আসিয়া, না-জানি আবার কি নূতন অনর্থ-সাধন করিয়া যাইবে! সে আবার আসিতেছে শুনিলে, আমি মরণেও শান্তি পাইব না।

নন্দকুমার। আপনি ক্লাইবের উপরই সকল দোষ চাপাইতেছেন। কিন্তু আপনার হাত হইতে নবাবী কাড়িয়া লইয়া মীরকাশেমকে নবাবী দেওয়ার সময়, ক্লাইব কোথায় ছিলেন? পলাশী যুদ্ধের পর আপনাকে মসনদে বসাইয়া ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে, ক্লাইব বিলাত চলিয়া যান। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে আপনার সিংহাসন-চ্যুতি ঘটে। কিন্তু তখন তো সর্ব্বেসর্ব্বা—ভান্সিটার্ট! ভান্সিটার্টই আপনার হাত হইতে নবাবী কাড়িয়া লন; তিনিই আবার, কয়েক মাস হইল, আপনাকে নবাবীতে অধিষ্ঠিত করাইয়াছেন। আপনার এই সিংহাসনচ্যুতি ও সিংহাসন-প্রাপ্তি বিষয়ে ক্লাইবের কি হাত ছিল?

মীরজাফর। এক ভস্ম, আর ছার। যা'ক্—ও সকল কথায় আর কাজ নাই। এখন কি ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়, তাহাই বিচার করিয়া দেখুন। আমার কর্ম্মফল আমি মর্ম্মে মর্ম্মে ভোগ করিতেছি!

পুনরায় অনুশোচনায় মীরজাফরের চক্ষু ছলছল হইয়া আসিল। মীরজাফর আত্মগ্লানি ব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন,—"আমার সিংহাসন চ্যুতি ও সিংহাসন-প্রাপ্তির কথাই বা কি বলিতেছেন! আমি যে আজি এই মহা-ব্যাধিগ্রস্ত, আমার পাপের ফলই তাহার কারণ নহে কি? মহারাজ! —কুষ্ঠব্যাধি কি অল্প পাপে হয়? বিশ্বাসঘাতকতা মহাপাপ। আমি মহাপাপী, তাই এই মহারোগগ্রস্ত।"

নন্দকুমার বাধা দিয়া কহিলেন,—আপনি ও-সকল অনুশোচনার কথা কেন কহিতেছেন? আপনার বয়ঃক্রম চুয়াত্তর বৎসর অতীত-প্রায়। এ বয়সে ব্যায়রাম-পীড়া স্বাভাবিক। তার জন্য অনুতপ্ত হইতেছেন কেন?"

মীরজাফর। মহারাজ! জিজ্ঞাসা করিতেছেন—অনুতপ্ত হইতেছি কেন? আমার প্রিয়পুত্র মীরণ বজ্রাঘাতে নিহত হইল; সে কি পাপের ফল নহে? আপনি কি বুঝিতে পারিতেছেন না—আমি দিবানিশি কি যন্ত্রণা

ভোগ করিতেছি! আমি জ্বলিয়া পুড়িয়া সারা হইলাম। এখন মরণই আমার মঙ্গল। তবে মরণের পর কিসে শান্তি পাই, সেই ভাবনায় বড়ই চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছি। আপনি বলিতে পারেন—মরণের পর আমার শান্তির উপায় কিছু আছে কি?

নন্দকুমার অন্য কথার অবতারণা করিলেন। বলিলেন,—"আপনার মৃত্যুর পর আপনার পুত্র মোবারক-উদ্দৌলা যাহাতে সিংহাসন লাভ করিতে পারেন, সে ব্যবস্থা এখন হইতে করিয়া রাখাই শ্রেয়ঃ।"

মীরজাফর। সে বিষয়ে যাহা ঘটিবে, আমি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি। মোবারক হয় তো নামে বাঙ্গালার নবাবী লাভ করিবে; কিন্তু জানিবেন—নবাবীর এই শেষ। কেবল নবাবীর কথাই বা বলি কেন, হয় তো ভারতে মোগলসাম্রাজ্যেরও এই শেষ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আপনার প্রতিষ্ঠার দিনও ফুরাইয়া আসিবে। আমার অন্তরাত্মা পুনঃপুনঃ আপনাকে সেই কথা বলিবার জন্য আমাকে উত্তেজিত করিতেছে। আমার ন্যায় আপনিও এমন অনেক বিষয়ে লিপ্ত আছেন, পরিণামে যাহার জন্য আপনাকেও আমার ন্যায় অনুতপ্ত হইতে হইবে।

মীরজাফরের বাক্যের গতি আবার পরিবর্ত্তিত হইল। মীরজাফর রোগের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পুনরায় নন্দকুমারকে কহিলেন, "মহারাজ! এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। আমার শান্তিলাভের উপায় কিছু বলিতে পারেন কি? আমি শুনিয়াছি, আপনাদের দেব-দেবী অনেকেই জাগ্রৎ আছেন! আমার এই কষ্ট দূর করিবার জন্য কোনও দেব-দেবীর অনুগ্রহ লাভ করিতে পারা যায় না কি?"

নন্দকুমার। হিন্দুর দেব-দেবীর প্রতি আপনার বিশ্বাস আছে কি? আমাদের দেবতা সত্যই জাগ্রৎ দেবতা। আপনি মুসলমান হইয়াও যদি

ভক্তিসহকারে সে দেবতায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন, আমি নিশ্চয় বলিতেছি, আপনার রোগের শান্তি হয়।

মীরজাফর। আপনি যাহা বলিবেন, আমি তাহাতেই প্রস্তুত আছি

নন্দকুমার। আপনি ভক্তিসহকারে দেবী কিরীটেশ্বরীর চরণামৃত পান করিতে পারেন? মা আমার সাক্ষাৎ শান্তিরূপিণী।

নন্দকুমারের বাক্যে মীরজাফরের ব্যাকুলতা অধিকতর বৃদ্ধি পাইল; মীরজাফর ব্যগ্রভাবে কহিলেন,—"তবে আপনি কি আমায় দেবীর চরণামৃত আনিয়া দিতে পারিবেন? আমি নিশ্চয় জানিয়াছি—আর বেশী দিন বাঁচিব না। যত সত্বর পারেন, আপনি মায়ের চরণামৃত আনিয়া দেন।

নন্দকুমার। আপনার যখন বিশ্বাস হইয়াছে, আগামী কল্য দেবীর পূজার পর তাঁহার চরণামৃত আনিয়া আপনাকে প্রদান করিব। সেই চরণামৃত পান করিবেন, মস্তকে রাখিবেন, সর্ব্বসন্তাপ দূরীভূত হইবে।"

দুই পরামর্শই স্থির হইল। মোবারক উদ্দৌলাকে সিংহাসনে বসাইবার পক্ষে চেষ্টা হইবে; মীরজাফরের অনুতপ্ত প্রাণে শান্তিদানের জন্য মহারাজ তাঁহাকে চরণামৃত আনিয়া দিবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শান্তি কোথায়?

"Can'st thou not minister to a mind diseas'd;
Pluck from the memory a rooted sorrow;
Raze out the written troubles of the brain,
And, with some sweet oblivious antidote,
Cleanse the stuff'd bosom of that perilous stuff,
Which weighs upon the heart."

—*Shakspeare.*

মীরজাফরের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া নন্দকুমার বাহিরে আসিয়াছেন। নিয়ামৎ খাঁ সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন; সসম্মানে অভিবাদন-পূর্ব্বক নন্দকুমারকে কহিলেন,—"আপনার সন্ধানে আমি আপনার বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম। আপনি বলিয়াছিলেন,—আজ নাটোরের বিবাদটা মিটাইয়া দিবেন। থাজুরা গ্রাম হইতে রঘুনন্দন লাহিড়ীর আত্মীয়গণ আসিয়াছেন। তাহার সঙ্গে আটগ্রামের হলধর মৈত্র প্রভৃতিও আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।"

নন্দকুমার দেখিলেন—উভয় সঙ্কট। এক দিকে নিয়ামৎ খাঁ অনুরোধ করিতে আসিয়াছেন; অন্য দিকে নবাবের মন চঞ্চল হইয়া আছে। এ

সময় নবাবকে বিষয়-কর্ম্ম-সম্পর্কে কোনও কথা বলিতে যাওয়াও বিধেয় নহে; অথচ, না যাইলেও, চলিতেছে না। অনেক দিন হইতে ঐ বিষয় লইয়া নানারূপ দরবার চলিয়াছে; কিন্তু কোনই মীমাংসা হয় নাই।

নিয়ামৎ খাঁ বলিলেন,—"নবাবকে আমি বলিয়া রাখিয়াছি। তিনি আজ এ বিষয় শুনিবেন বলিয়াছেন। সময়-মত আপনাকেও পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং আজ আর এ সুযোগ পরিত্যাগ করা কোনমতে উচিত নহে।"

নিয়ামৎ খাঁ—সম্পর্কে নবাব মীরজাফরের ভগ্নপতি। নবাব-সংসারে তাঁহার প্রভুত্ব-প্রতিপত্তিও যথেষ্ট। তিনি আসিয়া যখন অনুরোধ করিতেছেন, নন্দকুমার দ্বিরুক্তি করিতে পারেন কি? তথাপি নন্দকুমার বলিলেন,—"আমি এই মাত্র নবাবের নিকট হইতে আসিতেছি। তাঁহার মনের অবস্থা বড়ই খারাপ। আমার মানসিক অবস্থাও ভাল নহে। আজিকার দিনে এ দরবার স্থগিত রাখিলে ভাল হইত না?"

নিয়ামৎ খাঁ। স্থগিত রাখার কি প্রয়োজন? নবাবের মনের অবস্থা এখন আর ভাল হওয়ার আশা দেখি না। আমার ইচ্ছা, যা হয় আজি একটা শেষ হইয়া যাউক।

নন্দকুমারকে নবাব-সন্নিধানে উপস্থিত হইবার জন্য নিয়ামৎ খাঁ বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিতে লাগিলেন; বলিলেন,—"আপনার সিদ্ধান্তই সিদ্ধান্ত। আপনি যাহা ঠিক করিয়া দিবেন, কে তাহার অন্যথা করে?"

নন্দকুমার। নবাবের মেজাজ আজ ভাল নহে।

নিয়ামৎ খাঁ 'হা হা' করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"নবাব! নবাব আবার কে? আপনিই তো সব। একবার চলুন দেখি!—নবাব কেমন আপনার কথার অন্যথা করেন।"

অগত্যা নন্দকুমার যাইতে সম্মত হইলেন। মনে মনে কহিলেন,—

'খাঁ সাহেব যাহা বলিতেছেন, তাহা তো আর মিথ্যা নয়! আমি যাহা বলিব, সে কথায় কে আপত্তি করে?'

নিয়ামৎ খাঁ ও নন্দকুমার উভয়েই নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সংবাদ পাঠাইলেন।

নন্দকুমারকে বিদায় দিয়া, একাকী শয্যার উপর বসিয়া, নবাব ভূত-ভবিষ্যৎ কত-কি চিন্তা করিতেছিলেন। এক একবার ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া ভগবানকে ডাকিতেছিলেন; এক একবার আত্মগ্লানির আবেশে মনে মনে বলিতেছিলেন,—'হায়! কি করিতে গিয়া আমি কি ফল লাভ করিলাম! কেন আমার সে দুর্ম্মতি হইয়াছিল? কেন আমি তাহাকে বিশ্বাস করিয়াছিলাম? কেন আমি আমার স্বদেশের স্বজাতির বক্ষে তীক্ষ্ণ ছুরিকা বিদ্ধ করিয়াছিলাম?' ভাবিতেছেন, আর এক একবার ডাকিতেছেন,—"ভগবান! আমার পাপের কি কোনও প্রায়শ্চিত্ত নাই?"

এই সময় সহসা নন্দকুমার ও নিয়ামৎ খাঁর আগমন-বার্ত্তা লইয়া সংবাদ-বাহী ভৃত্য নিকটে উপস্থিত হইল। কুর্ণিশ করিয়া, সম্মুখে দাঁড়াইয়া, নিবেদন করিল,—"জাঁহাপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মহারাজ নন্দকুমার ও খাঁ সাহেব অপেক্ষা করিতেছেন।"

মীরজাফর মনে মনে কহিলেন,—'আবার কেন? একটু শান্তিলাভের চেষ্টা পাইতেছি; আবার এ কি বিঘ্ন! নিয়ামৎ খাঁই বা কেন আসিতেছেন?' যাহা হউক, তাঁহাদিগকে ডাকিয়া আনিতে কহিলেন।

নন্দকুমার ও নিয়ামৎ খাঁ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলে, নবাব মীরজাফর শয্যায় বসিয়াই তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিলেন; মিষ্টবাক্যে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—"আসুন মহারাজ! আসুন খাঁ সাহেব! আর কি কোনও নূতন কথা আছে?"

নন্দকুমার সসম্মানে উত্তর দিলেন,—"হুজুর! তাহা না থাকিলে, এ সময় আবার আপনাকে উত্যক্ত করিতে আসিব কেন?"

মীরজাফর। সে কি বলেন মহারাজ! আপনারা আসেন—সে তো আমার সৌভাগ্যের বিষয়। এ ব্যায়রামের সময় আপনাদিগকে যতক্ষণ সম্মুখে পাই, ততক্ষণ অনেক যন্ত্রণার লাঘব হয়।

নন্দকুমার। আপনি আমাদিগকে নিতান্ত ভালবাসেন; আমরাও তাই আবদার করিতে আসি। যদি অনুমতি করেন, খাঁ সাহেব ও আমি এবার যে জন্য আসিয়াছি, তাহা ব্যক্ত করি।

মীরজাফর। আমার নিকট কোন কথা কহিতে আপনারা এত সঙ্কোচ-ভাব প্রকাশ করিতেছেন কেন? যাহা বলিবার জন্য আসিয়াছেন, নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারেন।

নন্দকুমার। আপনার ন্যায় উদার মহান্ ব্যক্তির নিকট কোনও বিষয় জানাইতে কখনই সঙ্কোচ-বোধ করি নাই। তবে আজ আপনার শরীর নিতান্ত কাতর, তাই—

মীরজাফর বাধা দিয়া কহিলেন—"সঙ্কোচের কোনই কারণ নাই। আবার ফিরিয়া আসিতে হইল, এমন কি প্রয়োজন পড়িয়াছে—মহারাজ!"

যে কারণেই হউক, নন্দকুমার, সকল কথা বুঝাইয়া বলিবার জন্য খাঁ সাহেবকে অনুরোধ করিলেন। নিয়ামৎ খাঁ বলিতে গেলেন; কিন্তু বলিতে বলিতে কথা আট্‌কাইয়া যাইতে লাগিল। তিনি বলিতে গেলেন —"মহারাণী ভবানীর বিষয়-সম্পত্তি সমস্তই তিনি তাঁহার জামাতা রঘুনন্দনকে দান করিয়াছিলেন। কিন্তু জামাতা রঘুনন্দনের উত্তরাধিকারিগণ সে বিষয়-সম্পত্তি কিছুই এখন অধিকার করিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা তাই আপনার নিকট বিচার-প্রার্থী হইয়া আসিয়াছেন।" নিয়মাৎ খাঁ যত কথা বলিতে পারিলেন বা না পারিলেন, মহারাজ

নন্দকুমার সকল কথাই সামলাইয়া লইলেন। পরিশেষে মহারাজ নিজেই বুঝাইয়া বলিলেন,—"আজ প্রায় পাঁচ বৎসর হইতে এই সম্বন্ধে নবাব-সরকারে দরবার চলিয়াছে। কিন্তু এ পর্যন্ত কোনও বিচার-মীমাংসা হয় নাই। সংপ্রতি খাজুরা-গ্রাম হইতে রঘুনন্দনের আত্মীয়গণ নবাব-দরবারে উপস্থিত হইয়াছেন। আটগ্রামের এক জন গণ্য-মান্য ব্যক্তি এ সম্বন্ধে সাক্ষ্য-প্রদানে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন! হুজুর যদি হুকুম করেন, তাঁহাদিগকে হাজির করিতে পারি।"

নবাব ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন,—"আজ এ দরবার স্থগিত রাখিলে হয় না?"

নন্দকুমার। আমারও তাই ইচ্ছা। তবে খাঁ সাহেব বড়ই ছটেপটে করিয়াছেন। খাঁ সাহেব বলেন—পাঁচ বৎসর হইতে এ সম্বন্ধে দরবার চলিয়াছে; এবারও আবেদনকারিগণ ছয় মাস কাল মুর্শিদাবাদে বসিয়া আছেন। একটা বিচার-মীমাংসা শেষ করিয়া দিলেই গোল চুকিয়া যায়। হুজুরের মুখের কথা বৈ ত নয়? ন্যায্য বিষয়, ন্যায়সঙ্গত দাবী। মহারাণী ভবানীকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলে, এ দাবীর বিষয় তিনিও অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

মীরজাফর। সকলই সত্য বটে! সকল কথাই সঙ্গত বলিতেছেন বটে; কিন্তু বলিতে পারেন কি—মহারাণীর কন্যা এখন কোথায়? আজ সাত বৎসর অতীত হইল, রঘুনন্দনের মৃত্যু হইয়াছে। আমি শুনিয়াছি, সেই হইতেই মহারাণীর কন্যা তারাসুন্দরী মহারাণীর সঙ্গেই বসবাস করিতেছেন। এ অবস্থায়, আপনারা কাহার সম্পত্তি কাহাকে দিতে অনুরোধ করিতেছেন?

নন্দকুমার। অনুরোধ আমাদের কিছুই নাই। অনুরোধ এই,—হুজুর দেখুন, মহারাণী আপন সম্পত্তি জামাতা রঘুনন্দনকে দান করিতে

অঙ্গীকার করিয়াছিলেন কি না? তিনি যদি অঙ্গীকার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সে সম্পত্তিতে আবেদনকারিগণের স্বত্ব বর্ত্তিয়াছে কি না?

মীরজাফর। সত্য হউক, মিথ্যা হউক, আপনারা যখন বলিতেছেন, আমি সকলই মানিয়া লইতেছি। তবে আমি জানি, মহারাণী ভবানী অসামান্যা ধর্ম্মানুরাগিনী। তিনি যে কখনও অধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইবেন, তিনি যে কখনও পরস্ব অপহরণ করিবেন, অথবা তিনি যে কাহারও কোনরূপ অনিষ্টসাধনে চেষ্টা পাইবেন, এ বিশ্বাস আমার একটুও নাই।

নন্দকুমার। সে বিশ্বাস আমারও নাই। তবে ঘটনা যাহা ঘটিয়াছে তাহাই হুজুরে জানান যাইতেছে। বিশেষতঃ খাঁ-সাহেব এ সম্বন্ধে প্রমাণ-পরম্পরা দেখাইতে প্রস্তুত আছেন। তাঁহার অনুরোধেই আমি আপনার নিকট এ দরবার উপস্থিত করিয়াছি।

নিয়ামৎ খাঁ। হাঁ—হাঁ, প্রমাণ আছে বৈ কি!

মীরজাফর। ভাল। খাঁ সাহেব, আপনি একটু স্থির হউন। আমি মহারাজকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি। মহারাজ যদি সদুত্তর দিতে পারেন, আমি এখনই বিচার শেষ করিয়া দিব।

এই বলিয়া মহারাজ নন্দকুমারের প্রতি তীব্র-দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া মীরজাফর গম্ভীর-ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহারাজ! আচ্ছা, আপনিই বলুন দেখি,—এ বিষয়ে আপনার অন্তরাত্মা কি বলে? আপনার মনকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন, আর তার পর উত্তর দেন! আমার প্রশ্ন—মহারাণী ভবানী এ বিষয়ে দোষী কি নির্দ্দোষ? বলুন,—আপনার অন্তরাত্মা কি উত্তর দেয়?"

মহারাজ নন্দকুমার আর উত্তর দিতে পারিলেন না। তিনি কি উত্তর দিবেন? তিনি একবার ভাবিলেন—'বলি, মহারাণী নির্দ্দোষ!' আবার ভাবিলেন—'বলি, আমি কি জানি? যাহা শুনিয়াছি, তাহাই

বলিতে আসিয়াছি।' কিন্তু বলিতে কিছুই পারিলেন না। মীরজাফরের প্রশ্ন শুনিয়া, তিনি নীরবে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

নন্দকুমারকে নীরবে নতমুখে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, নবাব মীরজাফর উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন,—"কি মহারাজ! নীরব কেন? বলুন, আপনি যাহা বলিবেন, আমি তাহাই শুনিব।"

নন্দকুমার কোনও উত্তর দিতে পারিলেন না। মীরজাফর পুনরপি কহিলেন,—"মহারাজ! এ জীবনে আমি অনেক অপকর্ম্ম করিয়াছি; কিন্তু আর না! যাহা করিয়াছি, তাহারই যন্ত্রণায় প্রাণ অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। তাহার উপর আবার যদি আমি সেই পুণ্যময়ী মহারাণী ভবানীর প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হই, নরকেও যে আমার স্থান হইবে না! আমি যাহা শুনিয়াছি, আমি যাহা সন্ধান পাইয়াছি, তাহাতে মহারাণী ভবানীকে স্বর্গের দেবী বলিয়া আমার বিশ্বাস হইয়াছে। মহারাণী—অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়াও ব্রহ্মচারিণী; মহারাণী—রাজরাজেশ্বরী হইয়াও পরসেবাব্রতধারিণী! মহারাণী ভবানীর তুলনা কি আর এ সংসারে আছে? মহারাজ!—পরসেবাই যাঁহার শান্তি, পরহিত-সাধনই যাঁহার একমাত্র বৃত্তি, তিনি কি মানবী? কখনই না। আমি মুসলমান হইয়াও তাঁহার চরণে তাই কোটী কোটী প্রণাম করিতেছি।"

নন্দকুমার অস্বীকার করিতে পারিলেন না। মীরজাফর আবার বলিতে লাগিলেন,—"মহারাণী নির্দ্দোষ ত বটেই; অধিকন্তু তিনি অশেষ-গুণ-সম্পন্না। তিনি যেমন উচ্চমনা, তেমনই তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী। এক দিকে দয়াধর্ম্মে পরসেবাব্রতে তাঁহার প্রতিষ্ঠা, অন্য দিকে বুদ্ধিমত্তায় তিনি অদ্বিতীয়া। মহারাজ!—মনে আছে কি, শেঠ-ভবনে আমরা যেদিন সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করি, মহারাণী সেদিন কি বলিয়াছিলেন? মহারাণী স্ত্রীলোক হইয়াও যেরূপ তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে ভবিষ্যদ্দর্শন করিয়াছিলেন,

আমরা শত পুরুষপুঙ্গবে পরামর্শ করিয়াও তাহা স্থির করিতে পারি নাই। কেমন—মহারাণী তখন যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই এখন ঘটিতেছে কি না? সে বুদ্ধির কণামাত্রও যদি আমরা পাইতাম!"

মীরজাফরের মুখে যতই বাক্যের লহরী ছুটিতে লাগিল, অতীত-স্মৃতির বৃশ্চিক-দংশনে নন্দকুমারের হৃদয়কে ততই অধীর করিয়া তুলিল। ইতিপূর্ব্বে দুই একবার তিনিও যে মহারাণী ভবানীর প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছিলেন, এখন সে সকল কথা এক একবার মনে পড়িতে লাগিল। নবাব আলীবর্দ্দীর দরবারে মহারাণী ভবানীর স্বামী মহারাজ রামকান্তের রাজ্যচ্যুতির চক্রান্ত ব্যাপারে তিনিও যে লিপ্ত ছিলেন, তজ্জন্য অনুতাপ উপস্থিত হইল। তার পর, ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে, আর একবার তিনি মহারাণী ভবানীকে রাজ্যভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন; সে জন্যও অনুশোচনা আসিতে লাগিল। রামকান্তের প্রতিদ্বন্দ্বী দেবীপ্রসাদের পুত্র গৌরীপ্রসাদ সেবার পৈতৃক রাজ্য পুনরুদ্ধার জন্য উদ্যোগী হইয়াছিলেন; আর মহারাজ, নন্দকুমার তদ্বিষয়ে তাঁহাকে উৎসাহ দিয়াছিলেন। পরিশেষে এবার আবার নন্দকুমার, মহারাণীর স্বর্গগত জামাতা রঘুনন্দনের আত্মীয়-স্বজনের পক্ষাবলম্বনে মহারাণীর বিরুদ্ধে দরবার করিতে আসিয়াছেন। বার বার তিনবার! নন্দকুমারের লজ্জাবোধ হইল।

শেঠ-ভবনে ষড়যন্ত্র-সভার বিষয় স্মরণ করিয়া নন্দকুমার কহিলেন,—"আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহার একটী কথাও অতিরঞ্জিত নহে। সত্যই মহারাণী যাহা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, এখন বর্ণে বর্ণে তাহা সংঘটিত হইতেছে। হায়!—আমরা যদি তখন মহারাণীর পরামর্শে কর্ণপাত করিতাম!"

মীরজাফরের বাক্যে নন্দকুমারের চৈতন্যোদয় হইল। নন্দকুমার মনে মনে বড়ই কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন। তবে সে কষ্ট—সে অনুশোচনা—

কতক্ষণ যে স্থায়ী হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারা যায় না। মানুষ যখন উচ্চ-পদবীতে আরূঢ় থাকে, মানুষ যখন ঐশ্বর্য্য-মদে প্রমত্ত রহে, পাপকর্ম্মের জন্য অনুশোচনা উপস্থিত হইলেও, সে অনুশোচনা তাহার মনে অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। জানি-না,—ক্ষণপরেই নন্দকুমারের মতি-পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল কি না! জানি-না,—সেই হইতেই তিনি অনুশোচনার অন্তর্দ্দাহে অনুক্ষণ জর্জ্জরীভূত হইতেছিলেন কি না!

যাহা হউক, যে কারণেই হউক, নবাবের কথায় নন্দকুমার আর কোনরূপ প্রতিবাদ করিলেন না; পরন্তু নবাবের বিচারই সুবিচার বলিয়া মানিয়া লইলেন; মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিলেন,—"আপনি যাহা মীমাংসা করিয়া দিলেন, তাহাই ঠিক। আপনার কথাবার্ত্তা শুনিয়া, আমারও এখন মত-পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আমারও এখন মনে হইতেছে, মহারাণীর কোনই দোষ নাই।"

নিয়ামৎ খাঁর সে সম্বন্ধে আর কোনও কথা কহিবার সাহস হইল না। তিনি যে তরুকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, সেই আশ্রয়-তরুই যখন বাতাহত কদলীর ন্যায় ভগ্নকাণ্ড হইয়া ভূতলশায়ী হইল, তখন আর তিনি কি করিতে পারেন?

মীরজাফর বিচার শেষ করিয়া দিলেন। বিচারে রঘুনন্দনের আত্মীয়-গণের পরাজয় হইল। সে সম্বন্ধে মহারাণী ভবানীর কোনও ত্রুটি নাই—তাহাই সিদ্ধান্ত হইয়া গেল। নিয়ামৎ খাঁ যে আশায় নন্দকুমারের আশ্রয়-গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে আশা সম্পূর্ণরূপ বিফল হইল।

পরিশেষে, নন্দকুমার ও নিয়ামৎ খাঁ বিদায়-গ্রহণে প্রস্তুত হইলে, মীরজাফর ইঙ্গিতে নন্দকুমারকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিলেন। নিয়ামৎ খাঁ সেদিকে দৃক্‌পাত করিবার অবসর পাইলেন না। মীরজাফরের

বিচারে, অপিচ নন্দকুমারের মত-পরিবর্ত্তনে, কতকটা অভিমানে, কতকট রোষ-বশে, নিয়ামৎ খাঁ ক্ষুণ্ণমনে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

নিয়ামৎ খাঁ চলিয়া গেলে, নন্দকুমার বিদায় লইবার জন্য গাত্রোত্থান করিলে, মীরজাফর আর একবার তাঁহাকে কিরীটেশ্বরীর চরণামৃতের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন; বলিলেন,—"মহারাজ! দেবী কিরীটেশ্বরীর চরণামৃতের অপেক্ষায় আমি পথপানে চাহিয়া রহিলাম। আপনি নিশ্চয় জানিবেন, আপনি যতক্ষণ চরণামৃত না পাঠাইবেন, আমি ততক্ষণ পর্য্যন্ত জলগ্রহণ করিব না।"

নন্দকুমার। কাল দ্বিপ্রহরে মায়ের পূজার পর আমি চরণামৃত লইয়া আসিব। আপনার অসুস্থ দেহ; তত বেলা পর্য্যন্ত জলগ্রহণ না করিলে বড়ই কষ্ট হইবে।

মীরজাফর। কষ্ট কি মহারাজ! যে যন্ত্রণা অহরহ ভোগ করিতেছি, কিছুক্ষণ জলগ্রহণ না করিলে তাহার অপেক্ষা অধিক কষ্ট কখনই সম্ভবপর নহে। কল্যকার কথা কি বলিতেছেন? আমি আজ হইতে প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম; আজিও আর জলগ্রহণ করিব না,—কালিও না,—যতক্ষণ না চরণামৃত পান করিব, ততক্ষণ না।"

নন্দকুমার দুই একবার বুঝাইবার চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু মীরজাফর কিছুতেই তাহা শুনিলেন না। তিনি পুনঃপুনঃ বলিলেন,—"মহারাজ! এ জীবনের শেষ হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই। এখনও যদি মায়ের চরণে শরণ লইতে পারি, হয় তো তিনি পাপী বলিয়া উপেক্ষা না করিয়া একবার কৃপাকটাক্ষে চাহিতে পারেন। সেই আমার শেষ ভরসা।"

নন্দকুমার হারি মানিলেন। "তাই হইবে; মায়ের পূজার পর, যত সত্বর সম্ভব, আমি চরণামৃত লইয়া আসিব। সেজন্য চিন্তা নাই।" এই বলিয়া, নন্দকুমার বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। চলিয়া যাইবার সময়

কিন্তু কেবলই তাঁহার মনে হইতে লাগিল,—"মুসলমান হইয়াও দেবীর প্রতি নবাবের এত বিশ্বাস—এত ভক্তি! হিন্দু হইয়াও আমরা এ বিশ্বাস—এ ভক্তি দেখাইতে পারি কৈ!"

নন্দকুমার এই ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেলেন। মীরজাফর মনে মনে কহিলেন,—"মা কিরীটেশ্বরী কি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন না!" তাঁহার মনই সে কথার উত্তর দিল। তিনি আপনা-আপনিই বলিয়া উঠিলেন,—"মা-আমার অবশ্যই এ যন্ত্রণার অবসান করিয়া দিবেন। মার চরণামৃত পান করিলে আমার সকল যন্ত্রণার অবসান হইবে।"

কিন্তু এ তন্ময়-ভাব কতক্ষণ থাকিবে! মীরজাফরের চতুর্দ্দিকে পাপ-পুরুষ মোহজাল বিস্তার করিয়া আছেন। দেবীর প্রতি মীরজাফরের ভক্তি-ভাব দেখিয়া, তিনি ঈষৎ হাস্য করিলেন; মনে মনে কহিলেন,—"মূঢ়। এ তন্ময়-ভাব তোমার কতক্ষণ থাকিবে।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—o—

মোহজাল।

"যে দিকে যখন চায়, ফুল বরষিয়া যায়,
মোহ করে প্রেম-মধু ঢালিয়া রে।"

—ভারতচন্দ্র।

নন্দকুমার চলিয়া গেলে, মীরজাফরের প্রকোষ্ঠাভ্যন্তরে সহসা যেন বৈদ্যুতিক আলোক বিকাশ পাইল।

এ কি! এ তো চপলার চকিত চমক নহে! এ যে অচঞ্চল স্থির-সৌদামিনী!

মীরজাফর ইষ্ট-চিন্তা বিস্মৃত হইলেন। ব্যগ্রভাবে ব্যস্ত-সমস্তে চাহিয়া দেখিলেন—তাঁহার গৃহমধ্যে কি যেন এক দিব্য জ্যোতিঃ প্রকটিত হইল। মীরজাফর দেখিতে লাগিলেন,—যেন উজ্জ্বলতায় কক্ষ আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে, গৃহ-শোভা দর্পণে দর্পণে সে উজ্জ্বলতা প্রতিফলিত হইতেছে, বর্ত্তিকাধার বেলোয়ারি ঝাড়গুলিতে এবং দেওয়ালগিরিসমূহে সে উজ্জ্বলতা ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সুধা-ধবলিত কক্ষ-প্রাচীরে উজ্জ্বলতার চারু-চিত্র প্রতিবিম্বিত হইয়াছে! মীরজাফরের খট্টাঙ্গোপরি শল্‌মা-খচিত ভেলভেট-মণ্ডিত শয্যা ও উপাধান ছিল,—উজ্জ্বলতায় তাহা চাকচিক্যসম্পন্ন হইয়া উঠিল। মর্ম্মর-নির্ম্মিত গৃহ-প্রাঙ্গণ, মর্ম্মর-নির্ম্মিত মেজ ও কেদারাগুলি,—সকলই যেন উজ্জ্বলতায় উদ্ভাসিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

মীরজাফরের অনেকক্ষণ বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। ক্ষণেক পরে চমক ভাঙ্গিলে, মীরজাফর একদৃষ্টে এক জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সেই মূর্ত্তি ধীরে ধীরে মীরজাফরের শয্যার নিকট উপস্থিত হইয়া, বীণা-বিনিন্দী-কণ্ঠে প্রার্থনা জানাইল,—"জনাব! জনাব! অনুগ্রহ করিয়া এই সরবৎটুকু পান করুন। শরীর এখনই শীতল হইবে।"

মীরজাফর এ কি স্বপ্ন দেখিতেছেন? না—না!—এ তো স্বপ্ন নয়! মীরজাফর আকুল-কণ্ঠে কহিলেন,—"মণি—মণি! আমায় কি একটীবারও দেখা দিতে নাই?"

মণির বদনমণ্ডলে ঈষৎ হাস্য-রেখা প্রকটিত হইল। কিন্তু কৌশল-জালে সে হাস্য-রেখা আবৃত রাখিয়া, মণি বীণার ঝঙ্কারে উত্তর দিল,—"নাথ! আপনার চরণ-সেবার জন্য এ দাসী সর্ব্বদাই প্রস্তুত হইয়া আছে। কিন্তু আপনি সংসারের শত কার্য্যে নিয়ত বিব্রত;—আপনার

চরণ-সেবার সময় পাই কৈ?" যেন সুধা-কণ্ঠে সুধাধারা! মণির স্বর শুনিয়াই মীরজাফরের হৃদয় গলিয়া গেল। মীরজাফর আর কোনও সংশয়-প্রশ্ন তুলিতে পারিলেন না।

এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটিত। মণির অদর্শনে মীরজাফর কত সময় মণির সম্বন্ধে কত অপ্রিয়-চিন্তা পোষণ করিতেন; কিন্তু মণি সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলে সকল কথা—সকল চিন্তা ভুলিয়া যাইতেন। আজও তাহাই ঘটিল। আজ প্রায় আট দশ দিন মণি তাঁহার নিকটে আসে নাই। মীরজাফর মনে মনে মণির প্রতি বড়ই বিরক্ত হইয়াছিলেন; অভিমানবশে এ কয় দিন তিনি একবারও মণিকে ডাকিয়া পাঠান নাই; পরন্তু, মণি নিকটে আসিলে, মিষ্ট মিষ্ট দুই চারি কথা শুনাইয়া দিবেন মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু মণির মুখমণ্ডলে না-জানি কি মোহিনী মায়া আছে! মণির মুখ দেখিয়াই মীরজাফরের মাথা ঘুরিয়া গেল,—অভিমান কোথায় উড়িয়া পলাইল।

মণির কটাক্ষ-বাণে অতি-বড় বলবান্ ব্যক্তিই মুহ্যমান্,—মৃত্যু-শয্যাশায়ী বৃদ্ধ মীরজাফর সে কটাক্ষের নিকট কতক্ষণ সজীব থাকিতে পারেন? মণির রূপ, মণির বয়স, মণির বেশ-বিন্যাস,—কত জনকেই পাগল করিয়া রাখিয়াছিল। মীরজাফর তো কোন্ ছার। মণির শত দোষ দেখিতে পাইলেও মণিকে তাই মীরজাফর কখনও কোনও কথা কহিতে সাহসী হইতেন না। আজিও তাই আর কোনও কথা কহিতে পারিলেন না! পারিবার সাধ্য কোথায়?

মণি পূর্ণযৌবনা। ভাদ্র-মাসের ভরা নদী। সর্ব্বাঙ্গে রূপের তরঙ্গ ছুটিয়াছে। গণ্ডে, গোলাপ-কান্তি প্রস্ফুটিত। নয়নে নয়নে বিজলী খেলিতেছে। ভ্রমরকৃষ্ণ ভ্রূ-যুগল—বিজলীর পাশে পাশে ঘন-মেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছে। অপরূপ কারুকার্য্যসমন্বিত মসলিনের মসৃণ বসনে

মণির দেহ আবৃত ছিল। সেই সুচিক্কণ বসনাঞ্চল ভেদ করিয়া, সুন্দরীর রূপের ফোয়ারা ছুটিয়া বাহির হইতেছিল। মণির মস্তকের অবগুণ্ঠন—অর্দ্ধোত্থিত অর্দ্ধস্খলিত; সেই অবগুণ্ঠনান্তরালে বেণীবদ্ধ কেশরাশি—বিলম্বমান কৃষ্ণ-সর্পের ন্যায় তাঁহার পদপ্রান্ত স্পর্শ করিয়া আছে। সুন্দরীর পরিধানে রেশমের সাটি, গাত্রে বিবিধ-চিচিত্র কারুখচিত অঙ্গরাখা। তাঁহার চম্পকবিনিন্দী অঙ্গুলি কয়েকটীতে হীরকাঙ্গুরীয় ঝক্ ঝক্ জ্বলিতেছে। এক ছড়া মুক্তার মালা মণির গলায় সর্ব্বদা দোদুল্যমান থাকিত। নিতম্বে সোণার চন্দ্রহার; হস্তে হীরকবলয়; মস্তকে বিচিত্র মুকুট;—মণির যখন যাহা সাধ হইত, মণি তখনই সেই বেশে সুসজ্জিত হইত। হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান—ত্রিবিধ জাতীয় মহিলাদিগের পোষাক-পরিচ্ছদের মধ্যে যেটুকু পছন্দসই, মণি সখ করিয়া, তাহারই অনুকরণে আপনার পোষাক প্রস্তুত করাইয়া লইয়াছিল। কাহারও মনোরঞ্জনের আবশ্যক হইলে, মণির বেশ-ভূষার বাহার কতই বাড়িয়া উঠিত! মীরজাফরের নিকট মণি যখন উপস্থিত হইত, মণির কতই বেশ-বিন্যাস প্রকাশ পাইত।

যেমন বয়স, তেমনই রূপ, তেমনই বেশ-ভূষা। পরন্তু মণি তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিশালিনী। এবম্বিধ নানা কারণে, নবাব সংসারে মণির প্রতাপ অতুলনীয়। মণি প্রথম যেদিন নবাব মীরজাফরের দৃষ্টিপথে পতিত হয়, সেই দিন হইতেই মুর্শিদাবাদে মণির প্রভুত্ব-প্রতিপত্তি, সেই দিন হইতেই লোকে ধীরে ধীরে মণির পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত বিস্মৃত হইতে বাধ্য হইয়াছে। পূর্ব্বে মণি যে নর্ত্তকীর ব্যবসায় করিত, পূর্ব্বে মণি যে দেশে-বিদেশে মজুরা করিয়া ফিরিত, মণির প্রতাপে, সে কথা এখন আর কেহ উচ্চারণ করিতেও সমর্থ নহে।

মণি এখন—মণি বেগম। মণি বেগম মীরজাফরের প্রাণপ্রিয়া

প্রধানা মহিষী। সেকেন্দ্রার নিকট বালকুণ্ডা-গ্রামে মণির জন্ম হয়। দিল্লীতে মণি নর্ত্তকীর ব্যবসায়ে জীবিকার্জ্জন করিত। সেই সূত্রে মজুরা লইয়া মণি একবার মুর্শিদাবাদে আসে। মুর্শিদাবাদে আসিয়া, মীরজাফরের নজরে পড়িয়া যায়। সে আজ প্রায় ষোল বৎসরের কথা। নবাব আলিবর্দ্দী তখন জীবিত। মীরজাফরের প্রথমা পত্নী—নবাব আলিবর্দ্দীর ভগিনী সা-খানুম তখন জীবিত। সুতরাং গোপনে গোপানে মণি বেগমের ও মীরজাফরের মধ্যে প্রেম-প্রবাহ প্রবাহিত হয়। পরিশেষে মীরজাফর যখন বাঙ্গালার মসনদ অধিকার করিয়া বসেন, তাহার অল্প দিন পরেই মণি বেগম পাট-মহিষীর আসন প্রাপ্ত হন। বব্বু বেগম নামে মীরজাফরের আর এক যে পত্নী ছিলেন, তিনি তখন দ্বিতীয়া বেগমের স্থান লাভ করেন। যাহা হউক, এই হইতেই নর্ত্তকী মণি 'মণি বেগম' নামে পরিচিতা;—এই হইতেই তাঁহার প্রভাবে নবাব-পুরী প্রকম্পিতা। মণিবেগমের এখন দুই পুত্র। তাঁহার এক পুত্রের নাম,—নাজম-উদ্দৌলা; দ্বিতীয় পুত্র—সৈয়ফ-উদ্দৌলা। বব্বু বেগমেরও একটী পুত্র; তাহার নাম—মোবারক-উদ্দৌলা। মহারাজ নন্দকুমারের সহিত নবাব মীরজাফর বাঙ্গালার নবাবী-সম্বন্ধে সেদিন যে পরামর্শ করিতেছিলেন, সে পরামর্শ—বব্বু বেগমের পুত্র মোবারক-উদ্দৌলাকে সিংহাসন-দান-বিষয়ে। নাজম-উদ্দৌলা, সৈয়ফ-উদ্দৌলা এবং মোবারক-উদ্দৌলা,—মীরজাফরের এই তিন পুত্রের মধ্যে নাজম-উদ্দৌলাই জ্যেষ্ঠ। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন নাজম-উদ্দৌলার বয়স অনুমান অষ্টাদশ বৎসর, সৈয়ফ-উদ্দৌলা পঞ্চদশ-বর্ষীয়, মোবারক-উদ্দৌলা সপ্তম-বর্ষীয়।

কিন্তু যাউক সে কথা। মণিবেগম যখন হেলিয়া হেলিয়া দুলিয়া দুলিয়া চটুল চাহনীতে সম্মুখে আসিয়া মৃদুমন্দস্বরে কহিলেন,—"জনাব! অনুগ্রহ করিয়া এই সরবৎটুকু পান করুন;—দেহ শীতল হইবে," মীরজাফর

যেন স্বর্গ হাতে পাইলেন। তাঁহার প্রাণের-প্রাণ মণিবেগম আসিয়া এমন করিয়া অনুরোধ করিতেছেন; সরবৎ-পানে শত অনিচ্ছা থাকিলেও মীরজাফর আপত্তি করিতে পারিলেন না। মণিবেগম, মীরজাফরের মুখের নিকট সরবৎ ধরিলেন; মীরজাফর আগ্রহ-প্রকাশে সে সরবৎ পান করিলেন।

"এ কি! সরবৎ পান করিতেই আবার এ দেহ জ্বলিয়া উঠিল কেন? দেবীর চরণামৃত পানের পূর্ব্বে আর কিছু পানাহার করিব না মনে করিয়াছিলাম, তাই কি শরীর এমন জ্বলিয়া উঠিল!"

কিন্তু মণি পাছে মনে কষ্ট পায়,—মীরজাফর সেই জন্য আপনার যন্ত্রণার কথা চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা পাইলেন। বুদ্ধিমতী মণিবেগম তাহা বুঝিতে পারিলেন। বুঝিতে পারিয়া, ধীরে ধীরে মীরজাফরকে ব্যজন করিতে লাগিলেন। মণিবেগম স্বয়ং মীরজাফরকে ব্যজন করিবেন,—মীরজাফরের মনে স্বপ্নেও কখন সে আশার উদয় হয় নাই। সুতরাং সে যন্ত্রণার মধ্যেও মীরজাফর মনে মনে অভিনব আনন্দ অনুভব করিলেন। তিনি এক একবার বাধা দিয়া বলিতে লাগিলেন,—"মণি! তুমি কেন বাতাস কর? হাতে বেদনা হবে যে!"

মণিবেগম মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন,—"আপনাকে ব্যজন করিব,—ইহা তো আমার সৌভাগ্য। ইহাতে কি কখনও বেদনা অনুভব হয়? আপনি একটু সুস্থ হউন; তাহা হইলেই আমার সকল পরিশ্রম সার্থক হইবে।"

মীরজাফর কহিলেন,—"মণি! আমি বেশ একটু শান্তি অনুভব করিতেছিলাম। কিন্তু আবার যেন শরীরটা কেমন কেমন করিতেছে। মণি! বড় জ্বালা।"

মণিবেগম। আপনার কি যন্ত্রণা বোধ হচ্চে? দাসী কি কোন-প্রকারে সে যন্ত্রণার নিবৃত্তি করিতে পারে না?

মীরজাফর। সে যন্ত্রণা তুমি কি দূর করিবে—মণি! যতই পূর্ব্ব-স্মৃতি মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিতেছে, ততই আত্মগ্লানি-অনলে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছি। জানিনা—কোন্ প্রায়শ্চিত্তে এ জ্বালা নিবারণ হইতে পারে?

মণি বেগম। আপনি তো কোনও অপকর্ম্ম করেন নাই! অপকর্ম্ম বলিয়া মনে হইলে, আপনি তো কোনও কার্য্যেরই প্রশ্রয় দেন নাই! আমি তো সর্ব্বদা আপনার সুবিচারের বিষয়ই শুনিতেছি।

মীরজাফর। সারাজীবন আমি কেবল অবিচার ও অধর্ম্মের প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছি। কখনও কোনও বিষয়ে সুবিচার করিয়াছি বলিয়া আমার মনে হয় না।

মণি বেগম।—"কেন—গতকল্যও তো আপনার সুবিচারের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

মীরজাফর। কাল! সুবিচার!

মীরজাফরের স্মরণ হইল না। মণি বেগম স্মরণ করাইয়া দিলেন,— "মহারাণী ভবানীর বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে আপনি বড় সুবিচার করিয়াছেন। আপনার সুবিচার সকলেই মুক্ত-কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে।"

মীরজাফরের বদনে আনন্দ-রেখার বিকাশ পাইল। মীরজাফর আনন্দব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন—"এঁ—এঁ! তুমি এ সংবাদ কোথায় পাইলে?"

মণি বেগম। দাসী আপনার সকল কার্য্যের সমাচার সর্ব্বদাই রাখিয়া থাকে। পাছে কোনও বিষয়ে আপনার ভুল-ভ্রান্তি হয়, আর পাছে সেই ভুল-ভ্রান্তি-বশে আপনি মনঃকষ্ট পান, তাই আপনাকে স্মরণ করাইবার জন্য আমি সকল সংবাদ রাখিয়া থাকি।

মীরজাফর। মণি! তুমি যথার্থই আমার হিতাভিলাষিণী। বল

তো মণি!—আমার কোনও ভুল-ভ্রান্তির কথা তোমার মনে পড়ে কি?

মণি বেগম। আপনার ভুল! কৈ, কিছুই তো আমার মনে পড়ে না!

মণি বেগম যেন একটু চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে কহিলেন,—"না—কৈ, তেমন তো কিছুই মনে হয় না! তবে—"

'তবে' বলিয়াই মণি বেগম নীরব রহিলেন। মীরজাফরের কৌতূহল বাড়িয়া গেল। মীরজাফর আগ্রহসহকারে কহিলেন,—"মণি! কি বলিতেছিলে—বল! আমার নিকট সঙ্কোচ কেন? যদি কোনও ভুল-ভ্রান্তিই হইয়া থাকে, আমি তাহা সংশোধন করিয়া লইব।"

মণি বেগম। না, তেমন কথা কিছু নয়। সে একটা পুরাতন কথা। তা এখন থাক্; আপনি সুস্থ হউন; সময়ান্তরে সে কথার আলোচনা করা যাইবে।

মীরজাফর। সময় আর কবে হইবে—মণি! যাহা বলিবার আছে, এখনই আমায় বল। এখনও যদি সময় থাকে, কর্ত্তব্য-পালনে আমি পরাঙ্মুখ হইব না।

মীরজাফর একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মণিবেগমও সেই আগ্রহ-বশেই কথাটা যেন না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না। মণিবেগম কহিলেন,—"কথাটা তেমন কিছু নয়। সে কথা পালন না করিলেও যে বিশেষ কোনও দোষ আছে, তাহাও আমার মনে হয় না। তবে নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের ন্যায় আপনার যশঃজ্যোতিঃ সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হয়,—ইহাই আমার আকাঙ্ক্ষা; আর সেই জন্যই আপনাকে সেই কথা বলিতে সাহসী হইতেছি। আপনার স্মরণ হয় কি—আপনি ক্লাইবকে 'নুরচাজম' উপহার দিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন? তজ্জন্য আপনি একখানি দানপত্রও

লিখিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু সেই দান-পত্রে আজিও আপনার স্বাক্ষর হয় নাই। সেই দান-পত্রে স্বাক্ষর করিতে আপনার কি কোনও আপত্তি আছে?"

মীরজাফর শিহরিয়া উঠিলেন।

আবার সেই ক্লাইবের নাম। ক্লাইব আমাকে যাদু করিয়াছিল। সে কি মণিবেগমকেও যাদু করিয়া গিয়াছে! তাহাকে এই বিপুল অর্থ প্রদান করিবার জন্য মণিবেগমের এত আগ্রহ কেন? ক্লাইবের সহিত—হেষ্টিংসের সহিত—মণিবেগমকে মিশিতে দিয়া আমি তো তবে ভাল কাজ করি নাই! আমার কার্য্যোদ্ধারের পক্ষে, মণিবেগমের দ্বারা তাহাদের সহায়তা পাইয়াছিলাম সত্য; কিন্তু তার পর, তাহারা যে ব্যবহার করিয়াছে মণি তাহা সকলই তো অবগত আছে! তথাপি, মণি কেন আমায় ক্লাইবের নামে দান-পত্র স্বাক্ষর করিতে বলে! রহস্য কিছুই বুঝিলাম না! কিন্তু কি করি?"

মীরজাফর ভাবিতেছেন,—'কি করি! মণিবেগমের এ প্রস্তাবে কি উত্তর দিই!'

মীরজাফরকে নীরব দেখিয়া, মণিবেগম কহিলেন,—"ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ আছেন। পাছে ধর্ম্মভ্রষ্ট হন, তাই আপনাকে সে কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি। ক্লাইব আমার কেহই নয়; ক্লাইবকে ঐ অর্থ প্রদান না করিলে, অর্থ আমাদেরই ঘরে মজুত থাকিবে; নবাবী পাইলে, আপনার পুত্রই ঐ অর্থের অধিকারী হইবে। তবে যে আমি আপনাকে ঐ বিষয় স্মরণ করাইতেছি, সে কেবল আপনারই পারলৌকিক হিতসাধনের জন্য। ইচ্ছা হয়, আপনি ক্লাইবের নামে দান-পত্র লিখিয়া দিতে পারেন; ইচ্ছা না হয়, তাহাতেও হানি নাই!"

মীরজাফর মনে মনে কহিলেন,—"সত্যই তো! এ ব্যাপারে

মণিবেগমের স্বার্থ আদৌ নাই। মণিবেগম যাহা বলিতেছে, আমারই হিত-কামনায়। মণি নিঃস্বার্থ।"

মীরজাফর প্রকাশ্যে কহিলেন,—"মণি! তুমি সত্যই বলিয়াছ! ক্লাইব আমার যাহাই করুক, আমি তো প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ আছি!" এই বলিয়া, মীরজাফর সেই দান-পত্র দেখিতে চাহিলেন; কহিলেন,—"কৈ, সে দান-পত্র কোথায় আছে? আমায় আনিয়া দাও; আমি স্বাক্ষর করিতেছি।"

মণিবেগম দান-পত্র সেই প্রকোষ্ঠেই আনিয়া রাখিয়াছিলেন। এখন কৌশলে তাহা বাহির করিয়া লইয়া মীরজাফরের সম্মুখে ধারণ করিলেন। আর দ্বিরুক্তি হইল না। মীরজাফর দান-পত্রে স্বাক্ষর করিলেন। সেই দান-পত্র এবং দান-প্রদত্ত অর্থ সম্পৎ মণিবেগমের জিম্মায় রহিল। ক্লাইব কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইলে, মণিবেগম ক্লাইবকে তাহা প্রদান করিবেন, —স্থির হইল।

এই দান-পত্রোল্লিখিত সম্পত্তির নাম "নুরচাজম্" অর্থাৎ "নয়নের আলোক"। মীরজাফর একটা তহবিলকে "নয়নের আলোক" বলিয়া মনে করিতেন। সেই তহবিলে পাঁচ লক্ষ টাকা নগদ মজুদ ছিল; তদ্ভিন্ন, বহুসংখ্যক মোহর এবং বহুমূল্য জহরতে, মীরজাফর সে তহবিল পূর্ণ রাখিয়াছিলেন। পরবর্ত্তি-কালে মণিবেগম কর্ত্তৃক ঐ তহবিল ক্লাইবের হস্তে সমর্পিত হয়। এই তহবিল প্রাপ্ত হইয়া, ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রেল, ক্লাইব একটী 'ট্রাষ্ট' ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করেন। যে সকল ইউরোপীয় কর্ম্মচারী ও সৈনিক-পুরুষ ভারতবর্ষে আসিয়া ইংরেজের রাজ্য-প্রতিষ্ঠা-কার্য্যে দেহপাত করিবেন বা তদ্দরুণ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবেন, তাঁহাদিগের সাহায্যের জন্য এই ভাণ্ডার স্থাপিত হয়। মৃত ব্যক্তির বিধবা পত্নী বা নাবালক পুত্রগণ সেই ভাণ্ডার হইতে সাহায্য পাইবার অধিকারী হন।

রাজ-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলে তাঁহাদিগকেও ঐ ভাণ্ডার হইতে সাহায্য-দানের ব্যবস্থা হয়। ক্লাইব যখন এই ভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছিলেন, তখন এই ভাণ্ডারের আয় হইয়াছিল, বাৎসরিক চল্লিশ হাজার পাউণ্ড—এখনকার হিসাবে প্রায় ছয় লক্ষ টাকা।

ক্লাইবের নামের দান-পত্র স্বাক্ষর করাইয়া লইয়া, মণিবেগম কহিলেন,—"জাঁহাপনা! আপনার অন্তঃকরণ যে কত উচ্চ—কত উদার, এই দান-পত্রে জগৎ তাহা প্রত্যক্ষ করুক। মিত্রের প্রতি উদার ব্যবহার—অনেকেই করিতে পারে! কিন্তু শত্রুর প্রতি এমন উদারতা—জগতে কে দেখাইতে পারিয়াছে?"

মীরজাফর মনে মনে ভাবিলেন,—"একবার বলি—মণি, এ উদারতা কি আমি ক্লাইবের প্রতি দেখাইলাম?—তোমার ঐ সুধামাখা মুখ-খানি দেখিয়াই আমি যে ক্লাইবের সব শত্রুতার কথা ভুলিয়া গেলাম!" কিন্তু মীরজাফর সে কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিলেন না। তিনি কোনরূপ উত্তর দিবার পূর্ব্বেই মণিবেগম তাঁহার জয়-ধ্বনি করিয়া কহিলেন,—"প্রাণেশ্বর!—এই এক দান-ব্যাপারেই আপনার যশঃজ্যোতি পৃথিবীব্যাপী হইল।" এই বলিয়াই মণিবেগম মীরজাফরের ললাটে আপন কমল-হস্ত ন্যস্ত করিলেন;—প্রেম-বিহ্বলার ন্যায় অপাঙ্গে চাহিয়া কহিতে লাগিলেন,—"প্রাণেশ্বর! আপনি এত উদার—এত মহান্, দাসী এতদিন তাহা বুঝিতে পারে নাই। পদে পদে তাই কত অপরাধই করিয়া বসিয়াছে। আমি অবলা, আপনি আমায় ক্ষমা করুন।"

মীরজাফর চমকিয়া উঠিলেন। আজ যেন সকলই প্রহেলিকা বলিয়া মনে হইতে লাগিল! মণিবেগমের কাতরতায় বিচলিত হইয়া, মীরজাফর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মণি! আমি তো কৈ ভ্রমেও কখনও তোমায় কোনও রূঢ় কথা বলি নাই! তবে কেন তুমি আমায় অমন কথা কহিতেছ?"

মণিবেগম বাষ্প-গদগদ-কণ্ঠে উত্তর দিলেন,—"প্রাণেশ্বর! আমি মন্দভাগিনী, তাই সদাই শঙ্কা হয়,—শেষ জীবনে আমার অদৃষ্টে না-জানি কি কষ্টই লিখিত আছে! আমি যে আপনার বড় সোহাগের—বড় আদরের মণিবেগম ছিলাম!"

মণিবেগম বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিলেন। মীরজাফরের মনে হইল,—তাঁহার লোকান্তরের আশঙ্কা করিয়াই মণি ভবিষ্যৎচিন্তায় আকুল হইয়াছে। মীরজাফর সান্ত্বনা-ব্যঞ্জক-স্বরে উত্তর দিলেন,—"মণি! তুমি কেন দুঃখ করিতেছ! আমি ব্যবস্থা করিয়া যাইব,—আমার লোকান্তরের পরও তোমার গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিবে। তুমি অণুমাত্রও চিন্তিত হইও না।"

মীরজাফর আপনার হস্ত-প্রসারণে মণির মুখের বসন সরাইয়া দিলেন মণিবেগম ক্রন্দনের স্বরে কহিলেন,—"আমার আর কি আশা!—কি ভরসা! আমি আপনার প্রাণপ্রিয় বেগম ছিলাম; আপনার লোকান্তরে—ঈশ্বর না করুন—আমায় হয় তো বা কাহারও বাঁদী-বৃত্তি গ্রহণ করিতে হইবে।"

মীরজাফর চমকিত হইয়া কহিলেন,—"সে কি!—সে কি! সে কি কথা বল?"

মণিবেগম দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া উত্তর দিলেন,—"আমি কি মিথ্যা বলিতেছি? আমায় নাজম—আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র হইলেও—সে তো সিংহাসনের অধিকারী নহে! আপনার নবাবী আমলে আপনার যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই তো নবাব হইবার অধিকারী। সে যদি নবাব হয়, হাজার আমি তাহাকে পুত্রাধিক স্নেহ করি, সে কি আমায় বিমাতা বলিয়া উপেক্ষা করিবে না?"

মীরজাফর। মণি! তুমি যে কি জিজ্ঞাসা করিতেছ, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমার কনিষ্ঠ পুত্র মোবারক—সাত বৎসরের

বালক মাত্র। তাহার গর্ভধারিণী বব্বু বেগম—সম্পূর্ণরূপ সংসারজ্ঞানানভিজ্ঞা। মোবারক যদিও সিংহাসন লাভ করে, তোমাকেই তাহার অভিভাবিকার পদ গ্রহণ করিতে হইবে। তবে তুমি কেন অন্য চিন্তায় আকুল হইয়াছ?"

মণিবেগম। না—না, আমি আকুল হইব কেন? নাজম ও সৈয়দ আমার যেমন দুই পুত্র; মোবারককেও আমি আমার সেইরূপ বলিয়া মনে করি। অভিন্ন ভাবি বলিয়াই তো আমার যত-কিছু দুর্ভাবনা।

মীরজাফর। তাহাতে আবার দুর্ভাবনা কি? তিন জনের যেই হউক, একজন নবাব হইলেই হইল!

মণিবেগম। তাহাই তো বলিতেছি! কিন্তু আপনার মনে সে অভিন্ন-ভাব কৈ?

মীরজাফর। এমন কঠিন কথা কেন কহিতেছ—মণি! আমি কি আমার তিনটী পুত্রকেই সমান স্নেহের চক্ষে দর্শন করি না?

মণিবেগম। জাহাপনা! দাসী প্রগল্‌ভা। অপরাধ লইবেন না! যদি অভয় দেন, তবে বলিতে পারি,—তিন পুত্রের প্রতি আপনার সমান স্নেহ নাই।

মীরজাফর। কেন—কেন? কেন এমন কথা বলিতেছ?

মণিবেগম। প্রাণেশ্বর! যদি তিন পুত্রের প্রতিই আপনার সমান স্নেহ থাকিবে, তবে আপনি জ্যেষ্ঠ বিদ্যমানে কনিষ্ঠকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিবেন কেন?

মীরজাফরের যেন চৈতন্যোদয় হইল। মীরজাফর যেন ভুল বুঝিয়াছিলেন। সুতরাং লজ্জিত হইয়া উত্তর দিলেন,—'মণি! তুমি ঠিক বলিয়াছ। নাজাম আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র; সুতরাং সর্ব্বাগ্রে তাহাকেই সিংহাসন-দান কর্ত্তব্য কর্ম্ম।"

মণি বেগম। তাই তো আমি স্মরণ করাইয়া দিতেছি। নচেৎ, উহাতে আমার কি স্বার্থ আছে? ক্লাইবের নামের দান-পত্রে আমার যে স্বার্থ, এ ব্যাপারেও আমার তাহার অধিক স্বার্থ নাই। উভয় ব্যাপারেই আমি আপনার ভারবাহী দাসী মাত্র।

মণি বেগমের কথাগুলি মীরজাফরের হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রবেশ করিল। ক্লাইবের ব্যাপারে মণি বেগমের নিঃস্বার্থ ভাবের যে ছায়া-চিত্র তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহাতে সেই চিত্রই উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। মীরজাফর কহিলেন,—"আমার নাজমকেই সিংহাসনে বসাইতে হইবে। তোমার উপর সকল কর্তৃত্ব-ভার ন্যস্ত রহিল।"

মণি বেগম। আপনি বলিতেছেন বটে; কিন্তু নাজমের বিরুদ্ধে চারিদিকে ঘোর ষড়যন্ত্র-জাল বিস্তৃত হইয়া আছে। কি করিয়া সে জাল ছিন্ন করিতে পারিব? আমি অবলা,—অর্থ-সম্পদ্-হীন। আপনার আদেশ-পালন আমার পক্ষে কি প্রকারে সম্ভবপর হইবে?

মীরজাফর। মণি! কোনও ভাবনা নাই! আমার ধন-সম্পত্তি যাহা কিছু আছে, আজি হইতে সকলই তোমার অধিকারে আসিল। আমার লোকান্তরের পর, আমার প্রাণ-প্রিয় পুত্র নাজমকে বাঙ্গালার সিংহাসনে বসাইতে হইবে। তোমার উপর আমি সেই ভার অর্পণ করিয়া যাইতেছি। সময় আসিলে, যেমন করিয়া হউক, তুমি সে কার্য্য সাধন করিবে। এ বিষয়ে আমি এখনই আদেশ-পত্র স্বাক্ষর করিয়া দিতেছি। আর আর যাহা তোমার আবশ্যক হয়, তাহারও ব্যবস্থা করিব।

মণি বেগম। মহারাজ নন্দকুমার আপত্তি করিবেন না কি?

মীরজাফর। আমি তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিব। তিনি কখনই তোমার কথা অমান্য করিবেন না। অর্থ-বল—লোক-বল, কোনও

লেরই তোমার অভাব হইবে না। আদেশ-পত্রও যেমন ভাবে লিখিতে হয়, তেমন করিয়াই লিখিয়া দিব।

মণি বেগম। আপনার ন্যায়পরতা ও করুণার শেষ নাই। আপনার এ প্রস্তাব উত্থাপন করিবার পূর্ব্বেই আমার ধারণা ছিল,—ন্যায়-সঙ্গত প্রস্তাব আপনার নিকট কখনই উপেক্ষিত হইবে না। এ সম্বন্ধে আপনার আদেশ-পত্রের তাই একটা মুশাবিদাও করাইয়া রাখিয়াছি। সেইটা একবার পড়িয়া দেখিবেন কি?

মীরজাফর। তুমি মুশাবিদা করিয়াছ, তার আর দেখিব কি? দেও—কাগজখানা দেও—আমি সহি-মোহর করিয়া দিতেছি।

মণি বেগম কাগজখানা ধরিয়া রহিলেন। মীরজাফর সহি-মোহর শেষ করিয়া দিলেন।

সহি-মোহর শেষ হইলে, মণি বেগম পুনঃপুনঃ নবাব-সাহেবের ন্যায়পরতার প্রশংসা-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

মুখে প্রশংসা করিতে লাগিলেন বটে; কিন্তু মনে মনে কহিলেন,—"বড় সহজেই কাজ হাসিল হইয়াছে! আজ যদি সহি না হইত, বড়ই সঙ্কটে পড়িতাম! এখন সময় পাইব,—সাবধান হইতে পারিব! এখন দেখি—কে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়!"

এই সময় মীরজাফরের একবার মনে হইল,—"বব্বু বেগমের সহিত একটা পরামর্শ করা হইল না!" মীরজাফর তাই জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ছোট বেগম এখন কোথায়?"

তীক্ষ্ণবুদ্ধি মণি বেগম মীরজাফরের মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন; আপনা হইতেই উত্তর দিলেন,—"তাহার নিকটই আমি একবার যাইব বলিয়া মনে করিতেছি। সে আমার ছোট বোন্‌টীর মত। তাকে আমি বড় ভালবাসি। এমন একটা গুরুতর ব্যাপারে তার সঙ্গে পরামর্শ

একান্ত আবশ্যক। সে যদি ক্ষুণ্ণ হয়—তেমন ব্যবস্থায় আমি কখনই সম্মত নহি। যাই—তা'কে একবার আমি এই আদেশ-পত্রখানা দেখাইয়া আসি। সে কি বলে না বলে,—আপনার নিকট এখনই তাহাকে লইয়া আসিয়া শুনাইতেছি।"

এই বলিয়া মণি বেগম গৃহ-নিষ্ক্রান্ত হইলেন। যাইবার সময় মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"ছোট বেগম!—বব্বু বেগম! মূঢ় নবাব!—আর কি তাকে তোমার কাছে ঘেঁস্‌তে দেব?"

প্রকোষ্ঠে প্রবেশ-সময়ে মণি বেগম বিদ্যুতের ন্যায় বিকাশ পাইয়াছিলেন। বহির্গমন-কালে তাঁহাতে বজ্র-প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া গেল বিজলীর হাসি-রাশির-অন্তরালে বজ্র কি এইরূপভাবেই লুক্কায়িত থাকে?

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—o—

পরিবর্ত্তন।

"Weak and irresolute is man:
The purpose of to-day,
Woven with pains into his plan,
To-morrow rends away."

—*Cowper.*

নির্দ্দিষ্ট সময়ে, পরদিন অপরাহ্নে, মহারাজ নন্দকুমার নবাব-ভবনে উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে কিরীটেশ্বরীর পুরোহিত। দেবীর চরণামৃতের

পাত্র মস্তকে ধারণ করিয়া মহারাজের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পুরোহিত প্রকোষ্ঠাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। নবাব মীরজাফর, নন্দকুমারের আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কতক্ষণে চরণামৃত লইয়া নন্দকুমার আসিবেন,—তজ্জন্য পুনঃপুনঃ পথপানে চাহিয়া দেখিতেছিলেন। যন্ত্রণায় দেহ কাতর হইয়া পড়িয়াছিল; তথাপি, সকল যন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া, এক একবার শর্য্যার উপর উঠিয়া বসিতেছিলেন, আর এক একবার বহিঃপ্রকোষ্ঠে আসিয়া দণ্ডায়মান হইতেছিলেন। দেবীর চরণামৃত পান করিলেই সকল যন্ত্রণার অবসান হইবে,—মীরজাফরের চিত্ত তখন সেই চিন্তাতেই আকুল হইয়া ছিল।

নন্দকুমার আসিয়া উপস্থিত হইলে, মীরজাফরের আনন্দের আর অবধি রহিল না। পুরোহিতের মস্তকে কিরীটেশ্বরীর চরণামৃত দেখিয়া, মীরজাফর অনুপম আনন্দ অনুভব করিলেন। আনন্দ-গদগদ-কণ্ঠে তিনি নন্দকুমারকে কহিলেন,—"মহারাজ! আপনি সত্যই বলিয়াছিলেন। মায়ের চরণামৃত দর্শন-মাত্র যখন আমার যন্ত্রণার এত লাঘব হইল, এ চরণামৃত পান করিলে না-জানি আমি কি অনুপম শান্তিই লাভ করিব! আমি দিবানিশি সেই চিন্তায় বিভোর হইয়া আছি। দেন—আমায় চরণামৃত দেন! মায়ের চরণামৃত পান করিয়া এই সন্তপ্ত প্রাণ শান্তিলাভ করুক।"

চরণামৃত-পানে নবাব একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন, নন্দকুমারের ইঙ্গিত-ক্রমে পুরোহিত ব্রাহ্মণ, নবাবকে সেই চরণামৃত পান করাইলেন। ভক্তি-গদগদ-চিত্তে মায়ের চরণামৃত পান করিয়া, মীরজাফরের পরিতৃপ্তির অবধি রহিল না।

"আহা—কি আরাম! চরণামৃত পান করিবামাত্র আমার সকল যন্ত্রণার অবসান হইল যে!" মীরজাফর দেবীর উদ্দেশ্যে পুনঃপুনঃ প্রণাম

করিলেন। তাঁহার কণ্ঠ হইতে আপনাআপনিই যেন "জয় মা কিরীটেশ্বরী" ধ্বনি বিনির্গত হইল। "জয় মা কিরীটেশ্বরী" রবে প্রকোষ্ঠ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

চরণামৃত-পানে অভাবনীয় শান্তি লাভ করিয়া, মীরজাফর বলিতে লাগিলেন—"মহারাজ! আমি এ জীবনে কখনও এমন শান্তি লাভ করি নাই। মায়ের চরণামৃত এত শান্তিপ্রদ! আমি সারাজীবন অন্তর্দ্দাহে অস্থির হইয়া আছি; এমন শান্তিপ্রদ ঔষধ জানা থাকিতে, আপনি এত দিন আমায় সে সন্ধান দেন নাই কেন? মহারাজ!—আজি আপনাকে যে কি বলিয়া ধন্যবাদ দিব, ভাষায় তেমন শব্দ খুঁজিয়া পাইতেছি না। আমার মরণের দিনে আমি যে শান্তিতে মরিতে পাইব,—আমি স্বপ্নেও এ বিশ্বাস করিতে পারি নাই। আমার শেষজীবনে মা কিরীটেশ্বরী যে আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিবেন, মা যে এমন ঘোর নারকী পাষণ্ডকে চরণে স্থান দিবেন,—আমি ভ্রমেও কখন মনে করি নাই। মহারাজ! —আজ আমি প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলাম—দয়াময়ী সত্যই অধমতারিণী!"

দয়াময়ী সত্যই অধমতারিণী! তিনি যদি অধমতারিণী না হইবেন, পাপীর পরিত্রাণ কোথায় আছে? মা যদি দয়াময়ী স্নেহময়ী না হইবেন, সারা-জীবন পাপপঙ্কে নিমগ্ন থাকিয়া, চৈতন্যোদয়ে একবার মাত্র তাঁহাকে ডাকিয়া, পাপী পরিত্রাণ লাভ করিবে কেন? মানুষ মোহবশে বুঝিতে পারে না; তাই সময়ে সময়ে মায়ের করুণার কথা ভুলিয়া যায়। মা যে সাক্ষাৎ করুণা-রূপিণী! তাহা না হইলে, তাঁহার চরণামৃত-পানে মহাপাপী মীরজাফরের তাপ-তপ্ত-প্রাণ স্নিগ্ধ হইল কি প্রকারে? মোহান্ধ মন! তবু তুমি বুঝিতে পার না—মা কি, মা কেমন!

মায়ের অনুপম করুণার কথা স্মরণ করিয়া, মীরজাফর অধীর হইয়া উঠিলেন। "আমি মুসলমান হইয়াও দেবীর অনুগ্রহ লাভ করিলাম;

দেবীর চরণামৃত পান-মাত্র সকল যন্ত্রণার অবসান হইল ; মায়ের করুণার দৃষ্টান্ত ইহার অধিক আর কি হইতে পারে?” মীরজাফর পুনঃপুনঃ উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—“দয়াময়ী সত্যই অধমতারিণী!”

মীরজাফরের উক্তি-প্রত্যুক্তি শ্রবণ করিয়া, মহারাজ নন্দকুমার বড়ই আনন্দিত হইলেন। তিনিও মীরজাফরের সহিত সমস্বরে কহিলেন,—“দয়াময়ী সত্যই অধমতারিণী!” মহারাজ নন্দকুমার আরও বলিলেন,—“এত করুণা না হইলে মার-আমার করুণাময়ী নাম হইবে কেন? আপনি এতদিন যদি এ চরণামৃত পান করিতেন, আমার বিশ্বাস, এই রোগের যন্ত্রণা আপনাকে কখনই ভুগিতে হইত না। যাহা হউক, বেলা অপরাহ্ণ হইয়াছে ; আপনি অনাহারে আছেন ; এক্ষণে আহারাদির ব্যবস্থা করুন। আমরা এখন আসি।”

নন্দকুমার বিদায়-গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইলেন। মীরজাফর বাধা দিয়া বলিলেন,—“আর আহার! মহারাজ!—আর আমার আহারে প্রবৃত্তি নাই। যে সুধা পান করিয়াছি, তাহাতেই আমার সকল ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর হইয়াছে। তবে এখন একটী কথা আপনাকে বলিবার আছে। আমার মনে হইতেছে,—আজই আমার জীবনের শেষ দিন। বিষয়-কর্ম্ম সম্পর্কে যে সকল পরামর্শ করিবার ছিল, পূর্ব্বেই আপনাকে তাহা জানাইয়াছি। সে বিষয়ে আমার আর অন্য কিছুই বক্তব্য নাই। তবে নাজম যাহাতে বাঙ্গালার মসনদে অধিষ্ঠিত হয়, তৎপক্ষে আপনি একটু লক্ষ্য রাখিবেন।”

নন্দকুমার আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে নবাবের সহিত পরামর্শ হইয়াছিল,—নবাবের কনিষ্ঠ পুত্র মোবারককে সিংহাসনে বসাইতে হইবে। কিন্তু আজি আবার নবাব এ কি কথা বলেন? নন্দকুমার ভাবিলেন,—‘বোধ হয়, নবাব ভুল করিতেছেন।’ সুতরাং তাঁহাকে স্মরণ

করাইবার উদ্দেশ্যে কহিলেন,—"আপনার পূর্ব্ব পূর্ব্ব আদেশ অনুসারে মোবারককে সিংহাসনে বসাইবার বন্দোবস্ত স্থির করা হইয়াছে। আজ আবার কেন অন্য মত করিতেছেন? এখন আবার নাজমকে সিংহাসনে বসাইবার চেষ্টা পাইলে, বিশেষ গোল বাধিবার সম্ভাবনা।"

মীরজাফর। সে বিষয়ে আমি পাকাপাকি হুকুমনামা লিখিয়া যাইব। সন্ধ্যার প্রাক্কালে আপনি যদি আজ একবার আসিতে পারেন, বড় ভাল হয়।"

সহসা কেন নবাবের এইরূপ মতি-পরিবর্ত্তন ঘটিল,—মহারাজ নন্দকুমার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি পুনঃপুনঃ মোবারকের পক্ষ-সমর্থন করিতে লাগিলেন। কিন্তু মীরজাফর সে কথায় আর কর্ণপাত করিলেন না। নন্দকুমার বুঝিলেন,—'এখন আর আপত্তি করা নিষ্প্রয়োজন।' ভাবিলেন,—'যাহা হইবার, হইবে; এখন আর সে কথায় প্রয়োজন নাই।' তবে সন্ধ্যার সময় পুনরায় তাঁহাকে আসিতে অনুরোধ করায় তিনি কহিলেন—"কেন?—আর বিশেষ কিছু কারণ আছে কি?"

নবাব। তাহা না থাকিলে আর এত করিয়া বলিতেছি?

নন্দকুমার। কখন আসিতে বলেন?—অবশ্যই আসিব।

নবাব। আর কখন?—আমার অন্তিম-সময়ে।"

নন্দকুমার। আপনি কেন ওরূপ অমঙ্গলের কথা কহিতেছেন? আপনার শরীর সুস্থ হইয়াছে। আপনি শীঘ্রই সারিয়া উঠিবেন। আপনার কোনও চিন্তা নাই।

নবাব। মহারাজ! সত্যই আমার শরীর সুস্থ হইয়াছে। সত্যই আমার আর কোনও চিন্তার কারণ নাই। সত্যই আমি এখন সুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারিব। সত্যই দেবী কিরীটেশ্বরী আজি আমার প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়াছেন।

মীরজাফর আকাশের পানে ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া কহিলেন,—"সত্যই মহারাজ, ঐ দেখুন,—মা আমায় ডাকিতেছেন! সত্যই মহারাজ, ঐ দেখুন—মা আমার যন্ত্রণার অবসান করিতে চাহিতেছেন! মহারাজ!—সারাজীবন শুধুই আমি আত্মসুখ অনুসন্ধান করিয়া ফিরিয়াছি। মহারাজ! —সারাজীবন শুধুই আমি পরের অনিষ্ট-সাধনে চেষ্টা পাইয়াছি। মহারাজ!—সারাজীবন শুধুই আমি জলিয়া পুড়িয়া মরিয়াছি কিন্তু এক দিনও মনে এমন সুখ পাই নাই।' মীরজাফরের চক্ষু বাহিয়া জলধারা বিনির্গত হইতে লাগিল। নন্দকুমার সান্ত্বনা-বাক্যে কহিলেন,—"এ সময় কেন অতীত-চিন্তায় মনকে ব্যথিত করেন?" মীরজাফর আবেগ-ভরে উত্তর দিলেন,—"মহারাজ! আর তো মন ব্যথিত নয়! আর তো আমি চোরের ন্যায় আত্ম-অভিসন্ধি গোপন করিয়া আত্মগ্লানি-বিষে জর্জ্জরীভূত নহি! কাল প্রভাতে আপনাকে যখন ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলাম, তাহার অল্প পূর্ব্বেই আমার জ্ঞানসঞ্চার হয়। কাহার প্ররোচনায় কোন্ অপকর্ম্ম করিয়া, কিরূপ ফলভাগী হইয়াছি, সেই সময় সকলই আমি প্রত্যক্ষ দর্শন করি।" নন্দকুমার কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। মীরজাফর কি সূত্রে কি কথা কহিতেছেন—কিছুই বুঝিতে না পারায়, তাহা জানিবার জন্য নন্দকুমারের আগ্রহ হইল। কিন্তু সে সময় সে ভাব প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত নহে বুঝিয়া, নবাবকে সান্ত্বনা-দান-ছলে কহিলেন,—"আপনি এখন একটু বিশ্রাম করুন। সারাদিন উপবাসী আছেন; এখন আপনাকে কষ্ট দিতে ইচ্ছা হইতেছে না।"

মীরজাফর অধীর-কণ্ঠে উত্তর দিলেন,—"মহারাজ!—কষ্ট আবার কি? আমার সকল কষ্টই দূর হইয়াছে। তবে কি করিয়া আমার কষ্ট দূর হইল, তাহাই একটু বলিতেছি। বলিতে আর অল্প মাত্র বাকী আছে। একটু স্থির হউন।"

নন্দকুমার। আপনি যতক্ষণ থাকিতে বলেন, আমি ততক্ষণই

থাকিবার জন্য প্রস্তুত আছি। আপনার কষ্ট না হইলেই হইল। ভাল, কি বলিতেছেন,—বলুন!

মীরজাফর বলিতে লাগিলেন,—"গত কল্য প্রত্যূষে শয্যাত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে তন্দ্রাঘোরে আমি এক অলৌকিক স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। রোগের যন্ত্রণায়, কত কি বিভীষিকায়, সারারাত্রি আমার নিদ্রা হয় নাই। জাগিয়া জাগিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া, অবশেষে আমি ভগবানকে স্মরণ করিতেছিলাম। মহারাজ! বলিতে কি, জীবনে আমি আর কখনও তেমন আন্তরিকতার সহিত ভগবানকে স্মরণ করি নাই। জীবনে সেই আমার প্রথম আকুল আহ্বান্। ভগবানকে ডাকিতে ডাকিতে, শেষ রাত্রে আমার একটু তন্দ্রা আসে। সেই তন্দ্রাঘোরে আমি নানারূপ বিভীষিকা দেখিতে পাই। প্রথমে এক মহিষারূঢ় বিকটাকার কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ দণ্ড-হস্তে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া আমাকে কহিলেন,—'পাপিষ্ঠ! অনেক দিন তোর পাপের ভরা পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু নরকেও তোর স্থান নাই; তাই এত দিন তোকে লইতে পারি নাই। তোর জন্য এখন নূতন নরক প্রস্তুত। এইবার তোকে সেখানে যাইতে হইবে।' আমি তাঁহার চরণপ্রান্তে নিপতিত হইয়া, বিনয়-নম্র-বচনে কৃপাপ্রার্থী হইলাম। কিন্তু তিনি রোষকষায়িতলোচনে আমার প্রতি তীব্রদৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া কহিলেন,—'পাপমতি পিশাচ! তুই তোর আপন প্রভুর সহিত যে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিস্, অনন্ত কোটী বৎসরেও তোর সে পাপের শাস্তির শেষ নাই।' আমি বলিতে গেলাম,—'আমি কি করিব! দোষ—ক্লাইবের। পাপিষ্ঠ ক্লাইবই আমায় এই প্রভুদ্রোহিতায়—স্বদেশ-দ্রোহিতায় প্রলুব্ধ করিয়াছিল।' দণ্ডধর সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। বলিলেন,—'তুই না স্বীকার পাইলে, ক্লাইব তোর কি করিতে পারিত? দোষ তোরই; সুতরাং ক্লাইবের পাপের দণ্ডও তোকেই ভোগ করিতে হইবে।' আমি ক্লাইবের উদ্দেশে গালি-বর্ষণ করিতে লাগিলাম।

তখন, সেই দণ্ডধর পুরুষ, দণ্ড উত্তোলন পূর্ব্বক, আমার মস্তকের উপর নির্দ্দয়-ভাবে প্রহার করিতে লাগিলেন। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া আমি কাঁদিতে লাগিলাম। কাঁদিতে কাঁদিতে, 'খোদা—খোদা—খোদা! তুমি আমায় রক্ষা কর—আমি আর তোমার অবাধ্য হইব না'—এই বলিয়া, চীৎকার করিয়া উঠিলাম। চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে আমার তন্দ্রাভঙ্গ হইল। আমার প্রতিহারীরা জাগিয়া উঠিল। স্বপ্ন বলিয়া আমি সকল কথাই উড়াইয়া দিলাম।"

মহারাজ নন্দকুমার অধিকতর আগ্রহ-সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তার পর কি হইল?"

মীরজাফর। তারপর ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া, আমি পুনরায় নিদ্রার জন্য চেষ্টা পাইতে লাগিলাম। অল্পক্ষণ পরেই আবার আমার তন্দ্রা আসিল। আবার আমি কায়মনোবাক্যে ভগবানের শরণাপন্ন হইলাম। কাঁদিতে কাঁদিতে ডাকিলাম—'ভগবন্! আর যে যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না। একবার আমায় চরণে স্থান দাও। আমি আর তোমার অবাধ্য হইব না। সেই সময়, আমি দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু কে যেন আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া গেল,—'মীরজাফর! তোমার আয়ুঃকাল ফুরাইয়া আসিয়াছে। তুমি যাইবার জন্য প্রস্তুত হও।' আমি আবার আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া বলিলাম,—'আমি প্রস্তুত আছি। আপনি যেই হউন, আমায় চরণ-প্রান্তে স্থান দান করুন।' অদৃষ্ট-কণ্ঠের বাণী উত্তর দিল,—'তোমার অনুতাপ-আর্ত্তনাদ শুনিয়া, জগজ্জননী তোমার প্রতি প্রসন্না হইয়াছেন। মীরজাফর! তুমি দেবীর শরণাপন্ন হও।' আমি কাতর-কণ্ঠে কহিলাম,—'আপনি কে, আপনি কি বলিতেছেন, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না! যদি দয়া করিয়া আসিয়াছেন, আমায় পথ প্রদর্শন করুন।' সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর পাইলাম,—'মহারাজ নন্দকুমারের নিকট তোমার শান্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিও।

তিনিই তোমার শান্তির পথ দেখাইয়া দিবেন।' সে যেন দৈববাণী! দৈববাণী আরও বলিল,—'আর তিন দিন মাত্র তোমার জীবন-কাল। যদি সমর্থ হও, ইহার মধ্যে আপন কর্ত্তব্য-পথ অবধারণ করিয়া লইও।' ইহার পরই আমার সম্পূর্ণরূপ নিদ্রাভঙ্গ হয়।"

মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি যে কাল বঙ্গ-সিংহাসনের এবং আমাদের ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলেন, স্বপ্নে সে কথা কিছু শুনিয়াছিলেন কি?"

মীরজাফর। শুনিয়াছিলাম বলিয়াই তো আপনাকে বলিয়াছিলাম—মহারাজ সাবধান!—আপনার ভবিষ্যৎ বড়ই অমঙ্গলময়।

নন্দকুমার পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দৈববাণী আমার সম্বন্ধে কি বলিয়াছিলেন?"

মীরজাফর। মহারাজ!—মাপ করিবেন, সে কথা আর বলিব না। স্থূল মাত্র এই জানিবেন,—আমার জীবনাবসানের সঙ্গে সঙ্গে আপনার পদগৌরব সমস্ত নষ্ট হইবে। ক্লাইবই আসুন, আর যেই আসুন,—কেহই আপনাকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

এই বলিয়া, মীরজাফর আপন বক্তব্য কহিতে আরম্ভ করিলেন; কহিলেন,—"নিদ্রাভঙ্গ হইবা মাত্র প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়াই আপনাকে ডাকাইয়া পাঠাই। বিষয়-কর্ম্মের কথাবার্ত্তা শেষ হওয়ার পর, তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—'মহারাজ! আমার উপায় কি হইবে?—আমি মরণেও কি শান্তিলাভ করিতে পারিব না?' তাহাতে আপনি আমায় পরামর্শ দিয়াছিলেন,—'মা-কিরীটেশ্বরীর শরণাপন্ন হউন; তাঁহার চরণামৃত পান করুন;—আপনার সকল যন্ত্রণার অবসান হইবে।' মহারাজ!—সত্যই তাই। দেবী কিরীটেশ্বরীর চরণামৃত পান করার পর হইতে আমার ব্যাধির যন্ত্রণা দূরীভূত হইয়াছে। এই সন্তপ্ত দেহ এখন ক্রমশঃ যেন শান্তিধারায় স্নিগ্ধ হইতেছে। কতক্ষণে পূর্ণ-শান্তি পূর্ণ-

স্নিগ্ধতা লাভ করিব—এখন কেবল সেই প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি। মহারাজ!—আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া আর অল্পক্ষণ এখানে অপেক্ষা করেন, হয় তো আমার কবর পর্য্যন্ত দেখিয়া যাইতে পারেন?"

মহারাজ নন্দকুমার চমকিয়া উঠিলেন; বলিলেন,—"সে কি! আপনি কি বলেন? মার কৃপায় আপনি আরোগ্য হইবেন, মার কৃপায় আপনি শান্তিলাভ করিবেন। অকারণ কেন অমঙ্গল ডাকিয়া আনেন?"

মীরজাফর বাষ্পগদগদ-কণ্ঠে উত্তর দিলেন,—"মহারাজ! এখন অমঙ্গলই আমার মঙ্গল। এখন মরণই আমার শান্তি।" এই বলিয়া, নন্দকুমারকে আর একবার আসিবার জন্য তিনি অনুরোধ করিলেন; বলিলেন,—"শেষ দিনের শেষ মুহূর্ত্তে আপনাকে একবার দেখিতে পাইলে, আমার বড়ই তৃপ্তি হইবে।" পুনঃপুনঃ নবাব কেন তাঁহাকে আর একবার সাক্ষাৎ করিতে বলিতেছেন, নন্দকুমার তাহার কোনই কারণ উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। মনে মনে ভাবিলেন,—'নবাবের শরীরের অবস্থা ভাল নহে। তাই বোধ হয় নাজমকে নবাবী প্রদান-সম্বন্ধে পাকা-পাকি কোনও ব্যবস্থা করিয়া রাখিবেন; আর সেই জন্যই আসিতে বলিতেছেন।' সে কাজ যে পূর্ব্বেই শেষ হইয়া গিয়াছে,—নন্দকুমার তাহা তো জানিতেন না! যাহা হউক, সেই কথা মনে করিয়াই নন্দকুমার উত্তর দিলেন,—"সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমি নিজামতে উপস্থিত থাকিব। যখনই প্রয়োজন হইবে, সংবাদ পাঠাইবেন; আমি আসিয়া সাক্ষাৎ করিব।"

নন্দকুমার চলিয়া গেলেন। মীরজাফর বাঙ্গালার ভূত-ভবিষ্যৎ নানা ভাবনায় বিভোর হইয়া পড়িলেন।

মহারাজ নন্দকুমারের সহিত কিন্তু মীরজাফরের আর সাক্ষাৎ হইল না। বব্বু বেগমও আর পতির শয্যাপার্শ্বে আসিবার সুবিধা পাইলেন না। কি এক কুহক-জালে সকলের সকল পথ অবরুদ্ধ হইয়া গেল। মণিবেগম সতর্কতার সহিত সকলের সকল পথ বন্ধ করিলেন। অথচ, কেহই

তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে সমর্থ হইল না। কোষাগার তাঁহার আয়ত্ত্বাধীন রহিল। কর্ম্মচারিগণকেও তিনি বশতাপন্ন করিয়া লইলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

—o—

সমস্যায়।

"মা! একজন সন্ন্যাসী আসিয়াছেন। আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান।"

সেই উদ্যান-বাটিকা। দিবাশ্রমের পর যেখানে আসিয়া মীরজাফর ক্লান্তি দূর করিতেন, মণি আজ সেই উদ্যান-বাটিকায় বসিয়া মীরজাফরের স্মৃতির-উদ্দেশে নিভৃতে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। সেই রাত্রি—সেই সময়—সেই চাঁদ সেই ভাবে আলোক বিতরণ করিতেছে; কিন্তু কোথায় সে স্নিগ্ধতা—কোথায় সে পূর্ব্বরাগের প্রাণারাম আনন্দ! সেদিন যে কক্ষ অমিয়বর্ষী ছিল, আজ তাহা বিষাদ-বিষ বর্ষণ করিতেছে। সযত্নরক্ষিত সেই কক্ষের যে সামগ্রীটির প্রতি মণির দৃষ্টি পড়িতেছে, তাহাতেই তাঁহার অশ্রু অনিবার্য্য হইয়া আসিতেছে। মনে হইতেছে—মীরজাফরের ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল সামগ্রী আনন্দ-গদগদ ভাব প্রকাশ করিয়া, তাঁহাকে যেন কতই ভালবাসিত; আর এখন যেন, তাঁহাকে দেখিয়া, বিষাদ-মলিন ভাব প্রকাশ করিয়া, তাহারা তাঁহার অনাদর করিতেছে। একজনের অভাবে যে এমন হয়—মণি মর্ম্মে মর্ম্মে এখন তাহা অনুভব করিতেছেন। দেখিতেছেন—যেন চারিদিকেই

ষড়যন্ত্র—যেন চারিদিকে বিষম বিভীষিকা,—এখন আর মানুষ-প্রকৃতি কেহ যেন তাঁহাকে শান্তিদানে ইচ্ছুক নহে! মণি এইরূপ চিন্তামগ্না—আন্‌মনা; সহসা প্রতিহারী আসিয়া কহিল,—"মা! এক জন সন্ন্যাসী আসিয়াছেন; আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন।" বলিতে বলিতে, মণিবেগমের উত্তর পাইবার পূর্ব্বেই, সন্ন্যাসী আসিয়া প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন। প্রতিহারী, শাণিত তরবারি উত্তোলন-পূর্ব্বক, সন্ন্যাসীর মস্তকচ্ছেদের জন্য অগ্রসর হইল। বিনা অনুমতিতে সন্ন্যাসী কেন সে প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন—ইহাই প্রতিহারীর রোষের কারণ। কিন্তু সন্ন্যাসীর সেই তেজঃপুঞ্জ মূর্ত্তি—তাহার সে রোষাবেগকে স্বতঃই প্রতিহত করিল। পরন্তু ইঙ্গিতে মণিবেগমও প্রতিহারীকে নিরস্ত করিলেন। সন্ন্যাসীকে অভিবাদন-পূর্ব্বক মণিবেগম কহিলেন,—"ঠাকুর! আসন গ্রহণ করুন।"

প্রতিহারী দূরে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। মণিবেগম সন্ন্যাসীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"ঠাকুর! বলুন—আপনার কি প্রয়োজন? কি উদ্দেশ্যে আপনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন?"

সন্ন্যাসী। মা! আমার একটী প্রার্থনা আছে?

মণিবেগম। কি প্রার্থনা, বলুন; যদি সাধ্যাতীত না হয়, আপনি যাহা চাহিবেন, দিবার জন্য চেষ্টা পাইব।

সন্ন্যাসী। মা! আমার নিজের জন্য আমার কিছু প্রার্থনা নাই আপনার জন্যই আমি আপনার নিকট ভিক্ষার্থী।

মণিবেগম। কি আপনার বক্তব্য, নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারেন।

সন্ন্যাসী। দেখুন, মা, বন্ধনে যে কি সুখ, তা আপনি বেশ বুঝেছেন। নবাব মীরজাফরও বুঝে গিয়েছেন। রহমন—যে আপনাকে ক্লাইবের শিবির থেকে এখানে এনে মীরজাফরের সঙ্গে আবদ্ধ করে দেয়—তারও পরিণাম আপনি প্রত্যক্ষ করেছেন। তবে আর কেন? এই যে আজ আপনার নয়ন অশ্রুভারাক্রান্ত, এই যে আজ আপনার চিত্ত বিষম চিন্তা-জরাগ্রস্ত,

তার কারণটুকু ভেবে দেখেছেন কি? সুখ-শান্তি কোথাও খুঁজে পাচ্ছেন না; চারিদিকেই যেন বিভীষিকায় ঘিরে আছে; ইহার কারণ কি?

মণিবেগম। আপনিই বলুন।

সন্ন্যাসী। এ উদ্বেগের এ কর্ম্মের একমাত্র কারণ—বন্ধন। বন্ধনটা একটু শিথিল করুন দেখি!

মণিবেগম। বুঝেছি। কিন্তু কি করে শিথিল করা যায়?

সন্ন্যাসী। বিদুষী—বুদ্ধিমতী! তাও কি খোলসা করে বলতে হবে? ত্যাগই বন্ধন-মোচনের অমোঘ অস্ত্র। একবার একটু ত্যাগশীল হয়ে দেখুন দেখি—কি আনন্দ! আপনার আয়ত্তাধীনে এখন অতুল ধনসম্পৎ—আপনি এখন অসীম প্রভুত্বের অধীশ্বরী। ত্যাগ করতে আরম্ভ করুন দেখি—ধনস্পৃহা; ত্যাগ করতে যত্নবান হউন দেখি—প্রভুত্ব-ক্ষমতা! তা হ'তেই সুখী হবেন—তা হ'তেই শান্তি পা'বেন। এখন যাহারা আপনার শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত, তাহারাও তা হ'তেই বশতাপন্ন হ'বে। তদ্দ্বারাই আপনার যশোজ্যোতিঃ বিশ্ববিস্তৃত হ'বে। বলিতে বলিতে সন্ন্যাসী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। চক্ষুর নিমেষ পাল্টাইতে না পাল্টাইতে অদৃশ্য হইলেন।

মণি চিত্রপুত্তলির ন্যায় নিশ্চল নিস্পন্দ। কতক্ষণ পরে এক নূতন চিন্তার স্রোত তাঁহার অন্তর অধিকার করিল; সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসীর ও গোপালের—পাখীর বন্ধন-মোচন বিষয়ক-কাহিনী তাঁহার স্মৃতিপটে জাগিয়া উঠিল। তখন, "ত্যাগেই সুখ" এই মহাবাক্য—তাঁহার হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

সেই প্রতিধ্বনির ফলেই মণিবেগম আজ স্বপক্ষ-প্রতিপক্ষ সকলেরই প্রীতিভাজন—**মণিবেগম!**

ইতি প্রথম ভাগ

আমাদের ১৲ এক টাকা সংস্করণ উপন্যাস সিরিজে-

কি কি উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছে,—দেখিয়া কিনুন।

১। পাষাণী—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।
২। বাসন্তী— „ কালীপ্রসন্ন দাশ গুপ্ত, এম-এ।
৩। চোরাবালি—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বি-এ।
৪। মহিমাদেবী—শ্রীযুক্তা শৈলবালা ঘোষজায়া।
৫। দরদী—শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বি-এল।
৬। শেষরক্ষা—শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাভূষণ।
৭। দিপালী— „ ক্ষেত্রমোহন ঘোষ।
৮। বিচিত্রা—সাহিত্য-সম্রাজ্ঞী স্বর্ণকুমারী দেবী।
৯। রাঙাবর—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বসু।
১০। গোধূলী „ নবকৃষ্ণ ঘোষ, বি-এ।
১১। সুদের সুদ— „ নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাভূষণ।
১২। জন্ম এয়োস্ত্রী—শ্রীশরৎচন্দ্র পাল (পরিচালক)
১৩। উচ্ছৃঙ্খল—উপন্যাস-সম্রাজ্ঞী নিরুপমা দেবী।
১৪। প্রতিষ্ঠা—শ্রীযুক্তা সরসীবালা বসু।
১৫। ঘৃণাহতা— „ শৈলবালা ঘোষ জায়া (সরস্বতী)
১৬। কালোমেয়ে—পণ্ডিত শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
১৭। চরকার উৎসব—শ্রীযুক্তা সরসীবালা বসু।
১৮। মণিবেগম—শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী।

প্রত্যেকখানিই ১৲ এক টাকা, মাঃ ।• আনা।

নিয়মিত গ্রাহকগণের জন্য সডাক ১৴•।

শ্রীগোষ্ঠবিহারী দত্ত, } স্বত্বাধিকারী—কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির।
শ্রীশরৎচন্দ্র পাল। } ১১৪ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।